সুমন্ত আসলাম

বাউণ্ডুলে । ১১

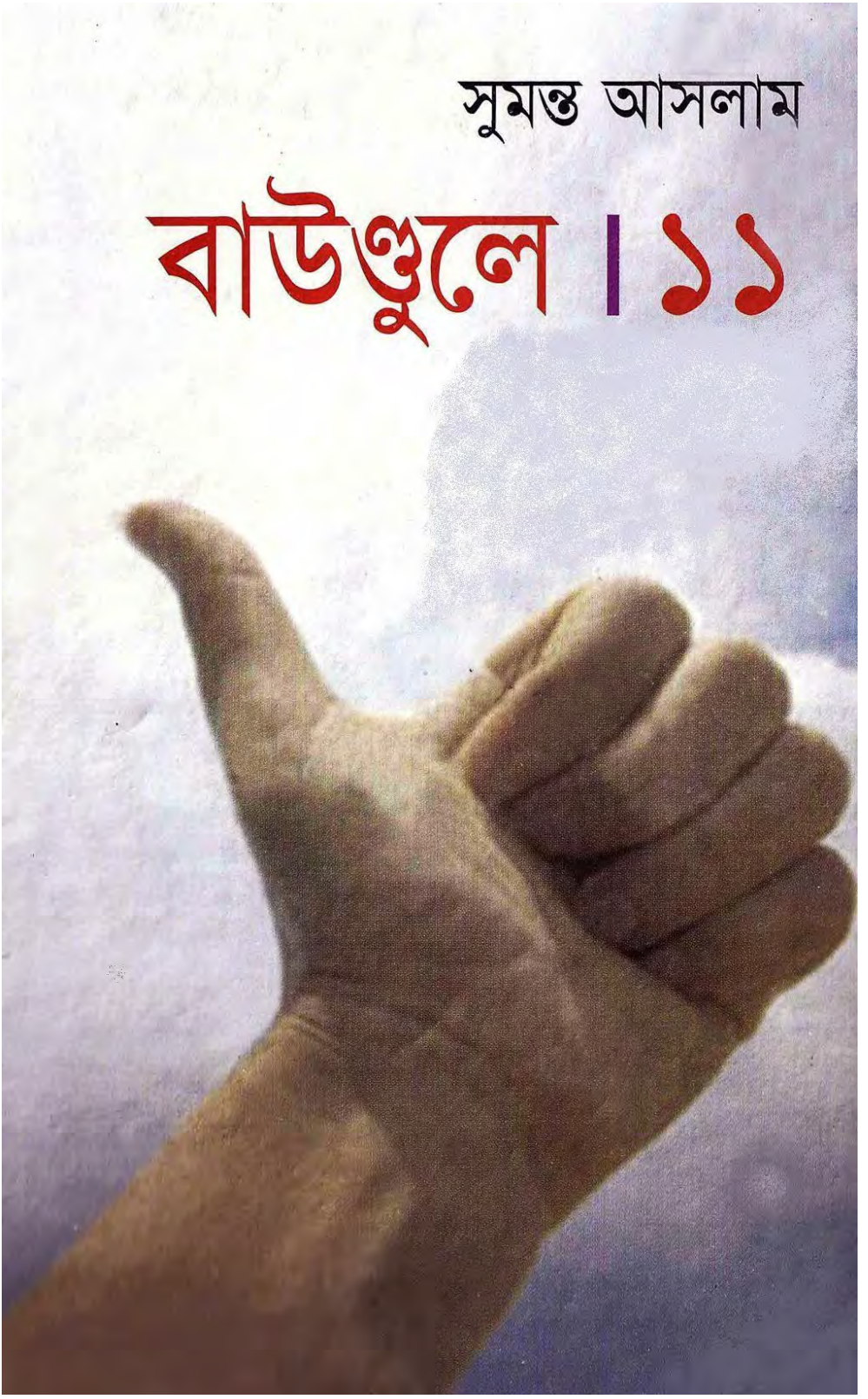

pdfpustak.com

দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১২
প্রকাশকাল একুশে বইমেলা ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ
সুহর্ষ সৌম্য

ISBN : 978-984-495-023-8

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : সৃজনী, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৩৫.০০

Bounduley-11 by Sumanto Aslam, Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100, First Published : February 2012, Price : 135 Tk. Only
e-mail : pearl_publications@yahoo.com
website : www.allaboutbangladesh.com
w.w.w.boi-mela.com

খুব সাধারণ একজন মানুষ তিনি—প্রথম দেখাতে এমনই মনে হয় তাঁকে। কিন্তু সাধারণের মাঝে যে অসাধারণত্ব লুকিয়ে থাকে, তিনি তাই। তিনি অন্যরকম। খুব ভালো আঁকেন তিনি; প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন চারুকলা থেকে; যার ছবি জাতীয় যাদুঘর সংগ্রহ করেছে; যিনি দেশের জনপ্রিয় একজন কার্টুন শিল্পীও। সব পরিচয় ছাপিয়ে যেটা তাঁর আসল পরিচয়—ভালো একজন মানুষ তিনি; খুব ভালো, চির অমায়িক।

প্রিয় বিপুল ভাই, প্রিয় বিপুল শাহ

এক জীবনে অনেক কিছু হওয়া সম্ভব, কিন্তু একজন ভালো মানুষ হওয়া খুব কঠিন। আপনি সেই কঠিন কাজটা করতে পেরেছেন। আপনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত, আনন্দিতও।

pdfpustak.com

বিয়ের পরে জুবায়ের তার বৌকে কী খাওয়াবে—সেটাই ছিল মনিকার মা মিসেস খায়রুনের প্রথম প্রশ্ন। কোনো জবাব দেয়নি জুবায়ের। শুধু এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে রেখেছিল দু ঠোঁটের মাঝখানে।

চার বছর সফল প্রেমের পর মনিকা তার প্রেমিক জুবায়েরকে বিয়ে করেছিল। মনিকার মা মিসেস খায়রুন প্রথমে ব্যাপারটাতে রাজি ছিলেন না। হ্যাবলা মার্কা ছেলে। এখনও লেখাপড়াই শেষ করেনি, চাকরি-বাকরি তো অনেক পরের কথা। তবুও মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার পছন্দের ছেলেকে মেনে নিলেন। ধুমধাম করে বিয়ে দিলেন তাদের। মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় মিসেস খায়রুন মেয়েকে ভালো করে আদর করলেন, তারপর তার হাতে একটা ব্যাংকের জমা বই দিয়ে বললেন, 'মা, তোমার জন্য আমি ব্যাংকে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলেছি। এটা সেই অ্যাকাউন্টের জমা বই। এটাকে তোমাদের বিয়ের স্মৃতি হিসেবে সব সময় যত্ন করে রাখবে। যখনই তোমাদের জীবনে কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটবে, তখন সেই ঘটনার স্মৃতি হিসেবে এই অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা জমা করবে। জমা রসিদের পেছনের দিকে কী কারণে টাকা জমা করেছ সেটা লিখে ফেলবে। যত আনন্দের ঘটনা ঘটবে তত টাকা জমা হবে। তাহলে ভবিষ্যতে একদিন এই জমা রসিদ দেখে পুরনো স্মৃতিতে ফিরে যেতে পারবে। আবার জমানো টাকাটাও কোনো একদিন নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। আজ তোমাদের বিয়ে হলো। সেই আনন্দের ঘটনার স্মরণে আমি এই অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা জমা করে দিয়েছি। ভালো থেকো।'

সুখ

মায়ের আইডিয়াটা খুবই পছন্দ হলো মনিকার। বাসর রাতে সে তার স্বামী জুবায়েরের সঙ্গে সেটা নিয়ে আলাপ করল। জুবায়েরও ভালো বলল আইডিয়াকে। সেই থেকে শুরু। মনিকা-জুবায়ের দম্পতি মায়ের

দেওয়া অ্যাকাউন্টে নানা ঘটনার স্মরণে টাকা জমা করতে লাগল।

১৯ জানুয়ারি : হানিমুনে খুব মজার সময় কাটানো উপলক্ষে পাঁচশ' টাকা জমা করা হলো।

০৭ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের পর জুবায়েরের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে জমা করা হলো এক হাজার টাকা।

০১ মার্চ : জুবায়েরের অফিসে প্রমোশন উপলক্ষে তিন হাজার টাকা জমা করা হলো।

২০ মার্চ : জুবায়েরের মা-বাবা বেড়াতে এসে নতুন বেবিকে দেখে দুই হাজার টাকা দিয়েছিলেন, সেটা জমা করা হলো।

০৬ ডিসেম্বর : তাদের ঘরে ফুটফুটে কন্যাসন্তানটার প্রথম হাঁটা উপলক্ষে এক হাজার টাকা জমা করা হলো।

মনিকা-জুবায়েরের জীবনে প্রতিনিয়ত আনন্দের ঘটনা ঘটতে লাগল আর টাকা জমা হতে লাগল সেই অ্যাকাউন্টে। তবে জমা দেওয়ার সময় মায়ের কথামতো জমা স্লিপের উল্টোপাশে কোন আনন্দের ঘটনার কারণে টাকা জমা করা হচ্ছে সেটা লিখতে ভুলল না।

পাঁচ বছর কেটে গেল। চিরাচরিত নিয়মে তাদের মধ্যকার ভালোবাসা কমে গেল কিছুটা। একসময় ঝগড়া শুরু করল তারা। এরপর সেটা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে গেল। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিল—আর একসঙ্গে সংসার করা যায় না, এবার আলাদা হতেই হবে। অগত্যা মনিকা তার মায়ের সঙ্গে ডিভোর্সের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করল, 'মা, আমার পক্ষে জুবায়েরের সঙ্গে সংসার করা আর সম্ভব নয়। ওর মতো বাজে ছেলে আমি আর কোথাও দেখিনি। এখন ভেবে অবাক হই, ওর মতো একটা ছেলেকে আমি কীভাবে বিয়ে করলাম! আমরা ডিভোর্সের ব্যাপারে একমত হয়েছি। তোমাকে জানানো দরকার তাই জানালাম।'

মনিকার মা মিসেস খায়রুন মেয়ের সিদ্ধান্তে কিছুটা অবাক হলেন। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এটা কোনো ব্যাপার না। অনেকের জীবনে এমনটা ঘটে থাকে। তোমার যেটা ভালো মনে হয় সেটা করো। তবে এর আগে একটা কথা, তোমার কি সেই জমা বইটার কথা মনে আছে, যেটায় তুমি টাকা জমা করতে? ডিভোর্স যখন দিয়েই দিচ্ছ তখন সেই টাকাগুলো রেখে লাভ কী। এমন বাজে একটা ছেলের স্মৃতি মনে রাখার কোনো মানে হয় না।'

মায়ের কথাটা পছন্দ হলো মনিকার। সে তার ব্যাংকে গিয়ে চেকের জন্য আবেদন করল। যখন সে চেকের জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন তার জমা বইয়ের রসিদগুলো নাড়াচাড়া করছিল সে আনমনে। এ সময় তার চোখ গেল সেসব লেখার

দিকে যেখানে তার মধুর স্মৃতিগুলো টুকে রেখেছিল সে। সেগুলো পড়তে পড়তে তার সব মধুর স্মৃতি মনে পড়তে লাগল এবং জলে ভিজে গেল তার দু চোখ। টাকা না তুলেই ফিরে এলো সে বাড়িতে।

বাড়ি ফিরতেই জুবায়েরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। জমা বইটা জুবায়েরের হাতে দিয়ে ডিভোর্সের আগে টাকাগুলো তুলে আনার জন্য অনুরোধ করল তাকে।

পরদিন মনিকার হাতে তার জমার বইটা ফেরত দিল জুবায়ের। মনিকা খেয়াল করে দেখল, জুবায়ের টাকা তোলার বদলে ব্যাংকে আরও পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে এসেছে। জমা দেওয়ার কারণ হিসেবে রশিদের পেছনে সে লিখেছে; 'অনেক দিন পর আজ আমি আবার মনে করতে পেরেছি যে, এই জীবনে তুমি আমাকে কতটা আনন্দ দিয়েছ। নতুন করে আবার আমার চোখ খুলে যাওয়ার কারণে আজ এই টাকাগুলো জমা করলাম।'

দৌড়ে গিয়ে জুবায়েরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল মনিকা।

আপনারা কি জানেন, শেষ বয়সে এসে তারা মোট কত টাকা জমা করেছিল? জানেন না। জানি না আমিও। কেবল জানি, মানুষের বুকের ভেতরটা দেখতে পারাই হচ্ছে সবচেয়ে সুখ, দেখাতে পারাটাও সুখ। হায়, আমরা যদি আমাদের দেশে সব রাজনীতিবিদের বুকের ভেতরটা দেখতে পেতাম!

আপনারা কি কখনও সিরাজগঞ্জ গিয়েছেন? ওই যে যমুনা-বিধৌত সিরাজগঞ্জ? প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে যে শহরের বাঁধ ভেঙে যায়? সারা বছর চুপচাপ বসে থেকে যে এলাকার অফিসাররা এই বর্ষা মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করে? বাঁধ ভাঙার অপেক্ষায় তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে? আর ভাঙা শুরু হলেই নয়-ছয় করে কোটিপতি হওয়ার পথে এগিয়ে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা ঠিকই ধরেছেন, কয়েকদিন আগে যেমন ভেঙে গিয়েছে বাঁধটা।

গণিতসম্রাট যাদব চক্রবর্তী খ্যাত, 'বাবুই পাখিদের ডাকি বলেছে চড়াই' কবিতার লেখক রজনীকান্ত সেন খ্যাত সিরাজগঞ্জে যেতে হলে আপনাকে একটা ব্রিজ পার হতে হবে। বিএনপিপন্থিরা যাকে বলে যমুনা ব্রিজ, আর আওয়ামীপন্থিরা যাকে বলে বঙ্গবন্ধু ব্রিজ। সেটা পার হলেই কিছু দূর যাওয়ার পর ডান দিকে যেতে হবে আপনাকে। তারপর সবুজ প্রান্তর পেরিয়ে একটা রেললাইন, সেটা পার হয়ে বাসস্ট্যান্ড, বাস থেকে নেমে যেখানে পা রাখবেন, সেটাই মূল শহর। ঠিক এ মুহূর্তে সেই শহরে গেলে আপনি খেয়াল করবেন, সেই শহরের সব মানুষের চেহারা কেমন যেন ম্লান, কেমন যেমন চিন্তাক্লিষ্ট। আপনি একটু আন্তরিক হলেই জানতে পারবেন, মাত্র দু'দিন আগে শহর রক্ষা বাঁধের অনেকখানি ভেঙে গেছে, আরও একটু ভাঙলেই পানি শহরে ঢুকবে এবং পানি ঢুকতে নিয়েই নদী তার আয়তন বাড়িয়ে ফেলবে। সেই যে আয়তন বাড়াবে, সেই আয়তন আর কমানো যাবে না!

আসুন ক্ষমা করি

সেখানে গিয়ে আপনি একটা কথাও শুনবেন। সিরাজগঞ্জের ওই বাঁধ রক্ষার জন্য এ পর্যন্ত যে টাকা ব্যয় হয়েছে বলে বলা হয়,তা দিয়ে সিমেন্টের ব্লক না বানিয়ে যদি ওই টাকাগুলো বান্ডিল করে ফেলা হতো, তাহলে এতদিনে স্থায়ী একটা বাঁধ নাকি তৈরি হয়ে যেত শহরের!

শহরের ভেতরে ঢুকলেন আপনি। এটা-ওটা দেখতে দেখতে হঠাৎ রাস্তার দু'পাশে দুটি বড় স্কুল দেখে থেমে গেলেন। খুব বিনয়ের সঙ্গে বলছি, ওই দুটির একটা স্কুলে আমি পড়েছি। এবার আপনাকে তাহলে একটা ঘটনা বলি।

আমাদের পণ্ডিত স্যার ছিলেন নগেন মুন্সী স্যার। ক্লাস নাইনে পড়ি আমরা তখন। অষ্টম পিরিয়ডে তিনি আমাদের ক্লাসে এসে উপস্থিত হঠাৎ। আমরা তো অবাক! এখন তো আমাদের আবদুল মালেক স্যার আসার কথা! তিনি তো আমাাদের আরবি পড়ান। পণ্ডিত স্যার হিন্দু মানুষ, তিনি কীভাবে আমাদের আরবি পড়াবেন!

পণ্ডিত স্যার খুব চেনা ভঙ্গিতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। হাসি হাসি মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদিও তোমাদের এখন আরবি ক্লাস, কিন্তু মালেক সাহেব জরুরি একটা কাজে বাড়িতে চলে যাওয়ায় আমাকে আসতে হলো। এখন তো তোমাদের ধর্ম ক্লাস। আমি বরং তোমাদের কিছু প্রশ্ন করি। বলো তো, মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য কী?'

আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে ছিল রবিন। ও দ্রুত হাত উঁচু করে বলল, 'ছার, মানুষের দুইট্যা পাও থাকে আর পশুর থাকে চাইরট্যা।'

হাসি হাসি মুখ নিয়েই স্যার বললেন, 'হ্যাঁ ওটা একটা পার্থক্য বটে, বাহ্যিক পার্থক্য। মানুষ আর পশুর মধ্যে মূল একটা পার্থক্য আছে। মানুষ ভুল করে, পশুরা কখনও ভুল করে না। যে শিয়াল মুরগি ধরে নিয়ে খায়, সেটা শিয়ালের ভুল নয়; কিন্তু কোনো মানুষ যদি আরেক মানুষের মুরগি চুরি করে খায় তাহলে সেটা ভুল। কারণ বোধ, মনুষ্যত্ব, বিবেক কথাগুলো মানুষের জন্য প্রযোজ্য, পশুর জন্য নয়।'

স্যার হঠাৎ থেমে গেলেন। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই আমাদের। রাস্তার ওপাশে হৈমবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ছুটি হয়েছে। দলে দলে ছাত্রীরা বের হয়ে যার যার বাসায় যাচ্ছে, আর আমরা তাদের হেঁটে যাওয়া দেখছি। বেশ কিছুক্ষণ পর আমাদের খেয়াল হলো, ক্লাস একেবারে নিশ্চুপ। ঝট করে আমরা সবই প্রায় এক সঙ্গে তাকাই। আগের মতোই হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন স্যার। আমরা সবাই ফিরে তাকানোর পর স্যার বললেন, 'তোমরা কি জানো, একদিন তোমাদের মেয়েরাও ওরকম স্কুল শেষে বাড়ি ফিরবে?'

কথাটার মানে সেদিন আমরা বুঝিনি। কিন্তু একটা জিনিস আমরা বুঝেছিলাম—এরকম একটা কারণে তিনি আমাদের কোনো ভর্ৎসনা করেননি, কোনো অসম্মানজনক কিছু বলেননি। অসম্মানজনক কিছু না করা মানে সম্মান করা। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ শিক্ষক নিতান্তই বালক বয়সী ছাত্রদের কী রকমভাবে সম্মান কয়েছিলেন সেদিন! জানেন, কথাটা মনে হলেই কী রকম একটা আবেশে চোখ দুটি ভিজে ওঠে আমাদের। স্যার এখন নেই। যদি থাকতেন, আহারে! তাহলে পরিমলের ঘাড়টা ধরে পণ্ডিত স্যারের পায়ের কাছে নিয়ে যেতাম। স্যারের পায়ের তালুটা ওর ওই গোলাপি জিভ দিয়ে ইচ্ছেমতো চাটাতাম।

খুন আর শ্লীলতাহানি যদিও একই বর্বরতা। আমরা তাই বরং পরিমলকে ক্ষমা করে দিই। আমরা রাষ্ট্রপতি হতে না পারি; কিন্তু রাষ্ট্রপতির মতো বিশাল একটা হৃদয় আছে না আমাদের!

খুব আহ্লাদিত হয়ে ছেলেটি বলল, 'বাবা, জানালার বাইরে একটু হাত রাখি আমি?' বাছিত সাহেব তার বাইশ বছরের ছেলেটির মাথায় হাত রাখলেন। তারপর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, 'বাইরে হাত দিতে তোমার কি খুব বেশি ইচ্ছে করছে, সাদাব?'

সাদাব ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'জ্বি, বাবা।'

'তাহলে দাও। তবে সাবধান।'

'সাবধান কেন, বাবা?' জানালার কাছ থেকে হাত সরিয়ে এনে বেশ কৌতূহলী হয়ে সাদাব বাছিত সাহেবের দিকে তাকাল।

'ট্রেন চলছে। বাইরে কোনো গাছ, গাছের ডাল, কিংবা লাইট পোস্টের সঙ্গে লেগে হাতে ব্যথা পেতে পার তুমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ বাবা, সাবধানে হাত দেব আমি।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সাদাব। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বাইরে হাত দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'বাবা, কী সুন্দর বাতাস লাগছে হাতে! খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। বাবা—।' সাদাব ভালো করে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'গাছগুলো কেমন পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে!'

সাদাবের কথা শুনে বাছিত সাহেব হাসলেন, মুগ্ধও হলেন।

২

যখন আলো এলো, বৃষ্টিও

নয় দিন আগে বিয়ে করেছে অনিন্দ্য ও লোপা। এ ট্রেনেই, সাদাবদের সামনে সিটে বসে ওরা চট্টগ্রাম যাচ্ছে। ওখান থেকে কক্সবাজার যাবে, হানিমুন করতে। ফিসফিস করে লোপাকে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল অনিন্দ্য, কিন্তু সাদাবের শিশুসুলভ উৎফুল্লতায় বেশ বিরক্ত হলো সে, রাগও হলো তার।

৩

সাদাব এবার একটু শব্দ করেই বলল, 'বাবা, কী সুন্দর পানি! ওগুলো তো পুকুর, না বাবা?'

'হ্যাঁ, কিছু পুকুরও আছে, কিছু ছোট ছোট নদীও আছে।'

'বাবা, আমি কিছু গরু-ছাগল দেখতে পাচ্ছি।'

'ওগুলো মাঠে ঘাস খাচ্ছে।

'বাবা—।' সাদাব এবার চিৎকার করার মতো করে বলল, 'গরুর একটা বাচ্চা দেখলাম আমি। বাচ্চাটা কেমন পা উঁচু করে দৌড়াচ্ছে। কেমন জোরে পা ফেলে দৌড়াচ্ছে। আচ্ছা বাবা, বাচ্চাটা পানিতে পড়ে যাবে না তো?'

'না, পড়ে যাবে না।'

সাদাব মাথাটা একটু উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, মেঘগুলো কেমন আমাদের এই ট্রেনের সঙ্গে যাচ্ছে। মেঘও কি আমাদের সঙ্গে চিটাগাং যাচ্ছে!'

৪

লোপার কানের কাছে মুখ এনে অনিন্দ্য বলল, 'অসহ্য! একটু যে গল্প করব সে উপায় নেই। বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু এখনও বাচ্চার মতো করছে।'

৫

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। বড় বড় ফোঁটা পড়ছে আকাশ থেকে। কয়েকটা ফোঁটা এসে সাদাবের হাত স্পর্শ করল। প্রচণ্ড আবেশে চোখ বুজে ফেলল সে। একটু পরে আগের মতোই চিৎকার করে বলল, 'বাবা, বৃষ্টির পানি কী ঠাণ্ডা! আরাম লাগছে আমার! বাবা, আস না, আমার সঙ্গে বাইরে একটা হাত রাখ না, প্লিজ!'

৬

অনিন্দ্য দুষ্টুমি করে কী একটা কথা লোপাকে বলতে যাচ্ছিল। সাদাবের চিৎকারে বলতে পারল না। রেগে গেছে সে। ক্রুদ্ধ গলায় সে বাছিত সাহেবকে বলল, 'আপনার ছেলের তো মানসিক চিকিৎসা দরকার। ওকে ডাক্তার দেখানো উচিত।'

বাছিত সাহেব ছলছল চোখে অনিন্দ্যর দিকে তাকালেন। খুব শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ঢাকায় তিন মাস চিকিৎসার পর আমরা আজ ডাক্তারের কাছ থেকে এলাম এবং আমার একমাত্র ছেলেটি জীবনের প্রথম চোখে আলো পেয়েছে, দেখতে পাচ্ছে সে। জন্মের পর থেকে সে অন্ধ ছিল!'

বাছিত সাহেবের পাশে এসে বসল সাদাব। তারপর কিছুটা শোওয়ার ভঙ্গিতে বাবার কাঁধে মাথা রাখল সে। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, দু চোখেও।

[ইন্টারনেট থেকে পাওয়া লেখা অবলম্বনে]

লেখাটা পড়া শুরু করেছেন আপনি এবং পড়তে সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট লাগবে আপনার। এই পাঁচ মিনিটে শাহরুখ খান তার দৈনন্দিন জীবনের খরচ হিসাবে একটা টাকার অঙ্ক খরচ করে ফেলবেন। সিগারেট খেতে খেতে আরও কিছু খরচের কথা ভাববেন। সবশেষে এ সময়টুকুতে খরচ করে ফেলবেন অন্তত কয়েক হাজার টাকা। সিগারেটের ধোঁয়ার মতো উড়ে উড়ে যাবে তার টাকাগুলো, কিন্তু কোনো রকম বিচলিত বোধ করবেন না তিনি এতে। টাকা রোজগারই করা হয় খরচ করার জন্য এ রকম একটা ভাব নিয়ে তিনি আরও একটি সিগারেটে আগুন লাগাবেন। এই পাঁচ মিনিটে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন তার চুল ধৌত করার জন্য কোনো নামি পার্লারে যাবেন। চুল ধোবেন, কালার করবেন, চুল শুকাবেন, তারপর ঘাড়ের পাশের চর্বি জমানো জায়গাগুলো কিছুক্ষণ ম্যাসাজও করাবেন। এতে খরচ হবে কয়েক হাজার টাকা। এরপর নখে রঙ লাগাতে লাগাতে তিনি ভাববেন, আগামী ছবিতে চুলের স্টাইল তিনি কী করবেন, কোন পোশাকটা পরলে তাকে আরও আকর্ষণীয় দেখাবে। মুখ ধোওয়া পানির মতো অবহেলায় নীরবে চলে যাবে আরও অনেক টাকা।

ক্রিস্টোফার রোনালদো এই পাঁচ মিনিটে কোনো শয্যাসঙ্গীর জন্য ব্যয় করে ফেলবেন কয়েক হাজার ডলার। এটি যেন মিডিয়ায় কোনোভাবেই না আসে এর জন্য ব্যয় করবেন আরও কয়েক হাজার ডলার। জার্সি বদলের মতো প্রতিনিয়ত বান্ধবী বদলে ফেলা এই তিনি নিজেকে বদলে ফেলেন ডলারের বদৌলতে।

প্রতিদিন এভাবে কত টাকা খরচ হয়!

মিরপুর স্টেডিয়ামের বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হয়েছিল আর ক'দিন আগে। স্টেডিয়াম এলাকা বদলে যাচ্ছিল প্রতিদিন। এই কয়েকদিন আগেও মেরামত

ক্ষুধা

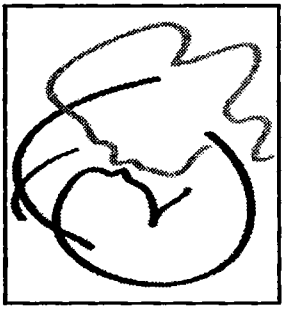

করা রাস্তাটা আবার ভাঙা হচ্ছিল বদলে ফেলা হচ্ছিল রাস্তার উপরিভাগ, দখল হয়ে যাওয়া জায়গাগুলো অবমুক্ত করা হচ্ছিল। খেলা শেষ হয়ে গেছে, রাস্তাগুলো আবার কোপাতে শুরু করেছে ওয়াসা, বিদ্যুৎ আর গ্যাসের লোকজন, মুক্ত হাতে তারা যেমন খুশি তেমনভাবে এবড়ো-থেবড়ো করে ফেলছেন সব। একই রাস্তা বারবার খোঁড়ার ফলে টাকার কী নির্ঝঞ্ঝাট অপব্যয়।

পদ্মা সেতু নির্মাণ হবে, অনেক টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু সেটা আবার যমুনা সেতুর মতো হবে না তো—কয়েক দিন পরই ফাটল দেখা দেবে না তো সেটাতে? ফাটল যদি দেখাই দেয় তাহলে এখানেও চুপ হয়ে থাকবে সবাই। যে কোম্পানি সেতু বানাল তার কোনো জরিমানা হবে না? অদৃশ্য কোনো শক্তি কিংবা কোনো অর্থ শক্তির বলে থেমে যাচ্ছে এসব? হায়, এখানেও কত অর্থ!

আমরাও অর্থ ব্যয় করি।

আমরা সিগারেট পান করে অর্থ ব্যয় করি।

আমরা নেশা করে অর্থ ব্যয় করি।

আমরা দামি দামি গাড়ি কিনে অর্থ ব্যয় করি।

আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক কিনে অর্থ ব্যয় করি।

আমরা পেট ভরে থাকার পরও খাবার কিনে অর্থ ব্যয় করি।

আমরা ইচ্ছা করলেই অর্থ ব্যয় করি।

অতঃপর একটি প্রামাণ্যচিত্র

শীতে ডুবে গেছে আকাশ। ঘন ধোঁয়া প্রতিবাদ জানাচ্ছে সূর্যকে—আলো যেন না জ্বলে আজ। গাছরা যেন শোক মাতমে চুপ। সর্বত্র বিচরণ করা কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে এখানে-সেখানে। প্রতিদিন খেটে খাওয়া মানুষগুলো চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয়ে রোবটীয় পায়ে হাঁটছে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে। সেই নিঃশ্বাসে ধূমপায়ীর মতো ঘন ধোঁয়া। স্বাবলম্বী মানুষগুলো লেপ কিংবা সুদৃশ্য কম্বল ছাড়েনি, ঘরছাড়া তো দূরের কথা।

রূপনগরের বড় রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। সবাই অপেক্ষা করছে—একটি গাড়ি আসবে, সেই গাড়ি থেকে ন্যায্যমূল্যে চাল দেবে। প্রতিজনকে তিন কেজি, প্রতি কেজি ২৪ টাকা। বাইরে এ চাল ৩২ টাকা। প্রতি কেজিতে ৮ টাকা কম। ৩ কেজিতে ২৪ টাকা।

এই ২৪ টাকা কমের জন্য একটা মা এসেছেন। কোলে তার শিশু। বয়স ২ মাস। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সে টুলটুল চোখে তাকিয়ে আছে, সেই শীতের কাতরতা। তার ঠোঁট দুটি কালো হয়ে গেছে, কাঁপছে থরথর করে। তার হাতের আঙুলগুলো কুঁকড়ে আছে, যেন মেলার শক্তি নেই তার। মাঝেমধ্যে সে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে, ওই খানে স্রষ্টা থাকেন, যেন সে মনে মনে বলছে, 'হে প্রভু, রিজিক দিয়ে তুমি আমাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছ। তার জন্য মাত্র এই দুই মাস বয়সে, এই প্রচণ্ড শীতে, খোলা আকাশ দেখতে হবে আমকে! প্রভু, আমার এখন কিছুই চাই না, শুধু তাপ দাও। আমি তো জমে যাচ্ছি, আমি তো মরে যাচ্ছি, প্রভু!'

সাজাহান খানের বাজে একটা অভ্যাস আছে—কোনো ব্যাপারেই কারও সঙ্গে কোনোরকম শেয়ার করতে পারেন না তিনি। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় অঙ্ক সার অঙ্ক বুঝাচ্ছিলেন, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না তিনি। কথাটা যে স্যারকে বলা দরকার, অঙ্ক না বুঝতে পারার ব্যাপারটা যে স্যারের সঙ্গে শেয়ার করা দরকার, তিনি তা করলেন না। এমনকি বাসায় গিয়ে বাবা-মাকেও বললেন না ব্যাপারটা। সারাক্ষণ মন খারাপ করে রইলেন, এখানে-ওখানে ঘুরলেন, একা একাই মাথার চুল টেনে হাতের মুঠোয় আনলেন। কাজের কাজ কিছুই হলো না। সেবার অঙ্কে তিনি কোনোরকমে পাস করেছিলেন, একশ'তে ঊনচল্লিশ পেয়েছিলেন।

যৌবনের প্রথম ধাপে প্রেমে পড়লেন সাজাহান। বুক শূন্য হয়ে থাকা ওই সময়টাতে কারও সঙ্গে কথা বলতে হয়, কারও সঙ্গে মনের ভাব আদান-প্রদান করতে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে সবকিছু খুলে বলে পরামর্শ চাইতে হয়। না, ওই বিষয়ে কারও সঙ্গে কোনোরকম শেয়ার করেননি তিনি। গুমরে মরেছেন একা একা, বিরহের কবিতা পড়েছেন চুপিচুপি, দুঃখে বুক ফেটে আসা গানও শুনেছেন দিন থেকে রাত—চব্বিশ ঘণ্টা।

স্কুল-কলেজ পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগ মুহূর্তে অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়, নিজের পছন্দ-অপছন্দ শেয়ার করতে হয়, কোন সাবজেক্ট নিলে ভবিষ্যৎ ঝকঝকে হবে—এগুলোর কোনোটির ব্যাপারেই কারও সঙ্গে নিজের মতামত শেয়ার করলেন না সাহাজাহান। নিজের ইচ্ছেমতো সাবজেক্ট পছন্দ করে পরীক্ষা দিলেন, চান্স পেলেন, ভর্তি হলেন, পাস করলেন, চাকরি পেলেন।

শেয়ার

অবশেষে একটা বিয়েও করলেন সাজাহান খান। বিয়ের প্রথম দিন কিংবা রাত থেকে জীবনের অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে অনেক কিছু শেয়ার করতে হয়। শেয়ার করেই জীবনকে নূতন করে শুরু করতে হয়। এখানে তিনি

কোনোরকম শেয়ার করলেন না। নিজেকে ভদ্র প্রমাণিত করার জন্য টুকটাক কথা বললেন নতুন মানুষটির সঙ্গে—ব্যস, এ পর্যন্তই। ঘুমিয়ে পড়লেন তারপর। এই ঘুমাতে গিয়েই প্রথম বিপত্তি ঘটে তার। মায়ের কাছে ঘুমানোর কাল কাটার পর থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত কারও সঙ্গে বিছানা শেয়ার করেননি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলেও বিছানা শেয়ার করতেন না তিনি। আলাদা করে এক কোণায় কোনোরকম ঘুমিয়ে নিতেন। কিন্তু বিয়ে করার পর বউয়ের সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতে হবে, বিয়ের ব্যস্ততায় এটা মাথায়ই আসেনি তার। বউ ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি ঘরের লম্বা সোফাটার ওপর আরাম করে ঘুমালেন। সকালে বউয়ের ঘুম ভাঙার আগেই বাইরে চলে গেলেন।

বিছানা সংক্রান্ত ব্যাপারে বউয়ের সঙ্গে সামান্য কথা বলেছিলেন তিনি, তারপর দুজনই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তটা গোপনীয়, তাই সেটার ব্যাপারে কেউ জানতে পারেননি।

সাজাহান খান সবচেয়ে কঠিন সময়ের সম্মুখীন হন চাকরিতে জয়েন করার পর। এ জায়গাতেই কিছু না কিছু হলেও কারও না কারও সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন তিনি। একদিন কলিগরা মিলে গোপন মিটিং ডাকলেন একটা। মিটিংয়ে সাজাহান খানকেও ডাকলেন। বাদল পাটোয়ারী নামে এক কলিগপ্রধান বললেন, 'সাজাহান সাহেব, আপনার সমস্যা কি বলেন তো?'

মাথা নিচু করে আপন মনে কী যেন ভাবছিলেন সাজাহান খান। চমকে উঠে বললেন, 'জি।'

'কই, আমার তো কোনো সমস্যা নেই।'

'সমস্যা থাকলে বলতে পারেন। আমরা সবাই মিলে সমাধান করে দিতাম।'

'না, আসলেই আমার কোনো সমস্যা নেই।'

বাদল পাটোয়ারী সরু চোখে সাজাহান খানের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু আমাদের তো সমস্যা আছে। আমরা যে টাকা বেতন পাই তা দিয়ে তো চলে না। নিজেরা খাব কী, বাসা ভাড়াই দেব কী, ছেলেমেয়ের লেখাপড়াইবা করাব কীভাবে? তার জন্য আমরা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—ফাইল ছাড়ানো বাবদ আমরা যে যা-ই পাই না কেন, প্রতিদিন সব টাকা একসঙ্গে করে সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে নেব। কিন্তু আমরা খেয়াল করেছি, আপনি ফাইল ছাড়ানো বাবদ কারও কাছে কোনো টাকাও নেন না, আমরা যা পাই তা থেকে আপনাকে যেটা দেই আপনি সেটাও নেন না। ব্যাপার কি বলেন তো?

সাজাখান খান এখানেও কোনো কিছু শেয়ার করলেন না। চাকরি ছেড়ে চলে এলেন বাসায়। কয়েকদিন পর ঘুষবিহীন আরেক চাকরিতে জয়েন করলেন।

টানা ৩৩ বছর পর চাকরি করে তিনি যে টাকা জমিয়েছিলেন, সেগুলো দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনে ভালোই চলে যাচ্ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ করে সঞ্চয়পত্রের ইন্টারেস্ট কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন তিনি। শেয়ারবাজারে গরম হাওয়া বইতে থাকে তখনই। জীবনের কারও সঙ্গে শেয়ার না করা সাজাহান খান, কারও সঙ্গে শেয়ার না করে, সব সঞ্চয়পত্র ভাঙিয়ে শেয়ারবাজারে প্রবেশ করেন একদিন।

গত বুধবার মতিঝিলের এক দোকানের কোণায় বসে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখা যায় সাজাহান খানকে। ষাটোর্ধ্ব একটা মানুষ চিৎকার করে কাঁদছেন, সবাই কারণ জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু বরাবরের মতো এবারও তিনি তার কান্নার কারণ শেয়ার করেন না। আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন সাজাহান খান।

বাজে একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছে বদিউল আঙ্কেলের, সকাল থেকেই হয়েছে। কারণে-অকারণে তিনি হাসেন, সুযোগ পেলেই হাসেন। কোনোভাবেই তিনি বুঝতে পারেন না, তার এই হাসি-রোগটা হঠাৎ কীভাবে হলো! দুপুরের দিকে কয়েকটা ছেলে এসেছিল তার বাসায়। আঙ্কেল তখন খাচ্ছিলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি মুখে ভাত নিয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'কী চাই?'

লম্বামতো ছেলেটা একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আঙ্কেল, ভাত খাচ্ছিলেন?'

'তোমার কি মনে হয়, ঘাস খাচ্ছিলাম আমি?'

'ঠিক তা না। তবে মানুষও চাবিয়ে খায়, গরুও চাবিয়ে খায় তো।'

'তাই নাকি! জানতাম না তো। হা-হা-হা।' দীর্ঘমেয়াদি একটা হাসি দিয়ে তিনি বললেন, 'খুব মজার কথা বললে তো তুমি, খুব মজা পেয়েছি আমি। হা-হা-হা।' হাসি থামিয়ে তিনি ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তো এতদিন ভেবেছি গরু চাবিয়ে না , গিলে খাবার খায়। হা-হা-হা।'

'আঙ্কেল, আমরা একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'আমার কাছে তো তোমরা দরকারেই আসবে। হা-হা-হা। তোমরা তো আমার বন্ধু না যে, দরকার ছাড়াও আমার কাছে আসবে, ইচ্ছে হলেই—।' ঢোলের মতো ফুঠে ওঠা নিজের পেট দেখিয়ে আঙ্কেল বললেন, 'আমার এই পেটে যখন তখন ঘুষি মারবে। হা-হা-হা।' আঙুলে লেগে থাকা এক টুকরো ভাত ঠোঁট দিয়ে চেটে নিয়ে তিনি বললেন, 'তা কী দরকারে তোমরা এসেছো, সেটা বলো?'

'আপনার এই বাড়ির পাশের জায়গাটাও তো আপনার।'

'কেন, কোনো সন্দেহ আছে তোমার? হা-হা-হা।'

'না, কোনো সন্দেহ নেই।'

মশা প্যানপ্যান করে

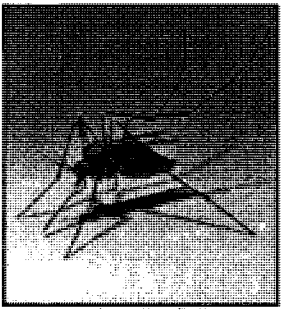

'তো?'

'ওখানে একটা ডোবার মতো আছে। সারাবছর পানি জমে থাকে সেখানে। এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন?' লম্বামতো ছেলেটা একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল।

বদিউল আঙ্কেল চোখ দুটো একটু বড় করে বললেন, 'তোমার কি মনে হয় চোখে আমি কম দেখি? হা-হা-হা। ওখানে যে সারাবছর পানি জমে, টোকাই শ্রেণীর ছেলেরা সাঁতার কাটে, মানুষজন এটা-ওটা ফেলে, সেটা তো আমি ঘরে বসেই টের পাই। হা-হা-হা!'

'কেন, আপনার ঘরে মশার খুব উপদ্রব বেড়েছে বলে!'

'আমার ঘরে মশা আসবে কোথা থেকে। হা-হা-হা।' দরজার দিকে একপলক তাকিয়ে বদিউল আঙ্কেল বললেন, 'তোমরা বোধহয় আমার দরজা-জানালার দিকে খেয়াল করোনি। আমার দরজা-জানালায় তো নেট লাগানো। হা-হা-হা। ওখান দিয়ে মশা ঘরে ঢুকবে কীভাবে? হা-হা-হা। যাওবা দু-একটা ঢোকে, স্প্রে আছে না? হা-হা-হা।'

'কিন্তু আঙ্কেল, আপনার না হয় দরজা-জানালায় নেট লাগানো আছে, স্প্রে আছে, অনেকেরই তো নেই। আপনার জায়গার ওই ডোবাতে মশা জন্মে। আশপাশের মানুষের রাতে ঘুমানো তো দূরের কথা, রাতে তারা মশারির বাইরেই থাকতে পারে না।'

'খুবই খারাপ কথা। হা-হা-হা।' বদিউল আঙ্কেল দরজা থেকে একটু বাইরে এসে বললেন, 'একটা প্রশ্ন করি তোমাদের—বলো তো, মশা আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কী?'

ছেলেটা প্রশ্ন না বোকার মতো তাকিয়ে রইল। বদিউল আঙ্কেল শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, 'মশা আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—মশা মানুষের গালে কামড় দিতে পারে, কিন্তু মানুষ মশার গালে কামড় দিতে পারে না। হা-হা-হা।'

'আঙ্কেল, একটা কিছু তো করা দরকার। হয় ডোবাটা মাটি দিয়ে ভরে ফেলা দরকার, নয় তো পানি পরিষ্কার রাখা দরকার।'

'ও দুটোর কোনোটাই আমার কাজ না। হা-হা-হা। আমি বরং একটা বুদ্ধি দিতে পারি তোমাদের। আজকাল কয়েলে কোনো কাজ হয় না, স্প্রে করেও মশা তাড়ানো যায় না। আমার বুদ্ধিটা হচ্ছে—আমাদের আশপাশ দিয়েই তো মশারা ভনভন করে। ঝট করে একটা একটা করে মশা ধরে ফেলা, তারপর দুই আঙুল দিয়ে মশার মুখটা ফাঁক করে সেখানে এক ফোঁটা করে লিকুইড ওষুধ ঢেলে দেওয়া। ব্যস, মশা না মরে যায় কোথায়! হা-হা-হা।'

লম্বামতো ছেলেটা বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আঙ্কেল, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলি দেখলে ভালো হয় না!'

কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন বদিউল আঙ্কেল। মাথা নিচু করে কী একটা ভেবে তিনি বললেন, 'শোনো ছেলেরা, পেপারে সকালে একটা খবর পড়েছি আমি। মশক নিধন বাবদ ঢাকা সিটি করপোরেশনে বছরে বরাদ্দ ১৭ থেকে ১৮ কোটি টাকা। কিন্তু প্রতি বছর মশা বাড়ছে তো বাড়ছেই। এই টাকাগুলো কোথায় যায়? আমার মনে হয়, এই ১৭-১৮ কোটি টাকা যদি এক টাকার কয়েন করে এলোপাতাড়ি সারা ঢাকা শহরে ছিটানো যায়, তাহলে ওই কয়েনের আঘাতেই সব মশা মরে শেষ হয়ে যাবে। কী, ঠিক বলেছি না? হা— ।'

বদিউল আঙ্কেল তার হাসিটা আর শেষ করতে পারলেন না। প্রচণ্ড শব্দে খকখক করে কাশতে লাগলেন তিনি। একটা মশা ঢুকেছে তার মুখের ভেতর, গলার ঠিক মাঝখানে আটকে আছে সেটা। একেবারে ভেতরেও ঢুকছে না মশাটা, বেরও হচ্ছে না। বদিউল আঙ্কেল কাশতেই থাকেন, চোখ বড় বড় করে কাশতে থাকেন।

খুব আন্তরিকভাবে বলছি, তোমাকে আজ আমি একটি গল্প বলব, ভালোবাসার গল্প। অন্যরকম ভালোবাসার গল্প। গল্পটা শুনতে শুনতে তুমি বুঝতে পারবে-এ পৃথিবীটা আসলে ভালোবাসার, ভালোবাসার জন্যই এ পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের আরও গভীরে গিয়ে তুমি অনুভব করবে—তোমার হৃদয়টা দুলছে। সেই অদৃশ্য দোলায় তুমি নিজেও দুলছ। দুলছে তোমার আশপাশ, তোমার ঘর, তোমার টেবিলের মানিপ্লান্ট, তোমার জানালার মাধবীলতা। একসময় খুব আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলে—তোমার মন আর তোমার মাঝে নেই, সে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে সে, নদীতে উড়ে বেড়াচ্ছে সে। ঘাসফুল, বটবৃক্ষ, প্রজাপতির ডানাতেও উড়ে বেড়াচ্ছে সে।

ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যা চাইলেও পাওয়া যায় না, আবার অনেক সময় না চাইলেও পাওয়া যায়। অনেকে এটা এত বেশি পায়, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায়; অনেকে না পেয়েও যন্ত্রণায় মরে যায়। তবে ভালোবাসার কাঙাল সবাই। সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান থেকে রাস্তার ওই ভিখারিও। ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ করে সবাই প্রতিদিন—ঘুম থেকে উঠেই, ঘুমাতে যাওয়ার আগপর্যন্ত।

প্রিয়তমা, এসো ভালোবাসার গল্প বলি

তোমাকে বোধহয় ভালোবাসার গল্প বলতে চেয়েছিলাম। তার আগে তোমাকে অন্য একটা গল্প বলি। আমাদের বাড়ির তিন বাড়ির পেছনে সাজাদ ভাই থাকতেন। সাজাদ ভাই হচ্ছেন এমন একটা মানুষ, যিনি প্রতি মিনিটে মিনিটে প্রেমে পড়েন। আরও একটু খোলাখুলিভাবে বললে বলা যায়, সেকেন্ডে সেকেন্ডে পড়েন। সাতচল্লিশ বছর বয়সেও তিনি সমানতালে প্রেম করে যাচ্ছেন। অল্পবয়সী থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী, এমনকি পড়ন্ত বয়সীদের সঙ্গেও।

বাসে করে একদিন বাসায় ফিরছিলেন সাজাদ ভাই। তিনি আবার বসেছিলেন মহিলাদের সিটে। কয়েক স্টপেজ পার হওয়ার পর এক মহিলা উঠলেন

বাসে। সাজাদ ভাই উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বললেন, 'না না, উঠতে হবে না আপনার। আপনি বসুন।'

সাজাদ ভাই বসলেন। তার পাশে বাসের ভেতরের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলাটি। বাস দুলছে, মহিলাও দুলছেন। একটু পরপর সাজাদ ভাইয়ের গায়ে তার শাড়ির ছোঁয়া লাগছে, মহিলাও কিছুটা ঝুঁকে পড়ছেন তার দিকে, অন্যরকম এক অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে সাজাদ ভাইয়ের মন। আরও দুই স্টপেজ যাওয়ার পর সাজাদ ভাই আবার উঠে দাঁড়ালেন। এবারও মহিলা বললেন, 'বললাম না, আপনাকে উঠতে হবে না। বসুন আপনি।'

কিছুটা বিব্রত ভঙ্গিতে বসে রইলেন সাজাদ ভাই। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর সাজাদ ভাই বললেন, 'ম্যাডাম, ব্যাপারটা হয়েছে কী...!'

মহিলা সাজাদ ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি বিব্রত হবেন না তো...। এভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে আমার।'

'আসলে হয়েছে কী...।'

সাজাদ ভাই এবারও কথা শেষ করতে পারলেন না। আর আগেই মহিলাটি ঝুঁকে এলেন তার দিকে। সাজাদ ভাইয়ের পুরো মুখ ঢেকে গেল তার শাড়ির আঁচলে। মনের ভেতরটা উথাল-পাতালে ভরে গেল তার। কিন্তু আরও একটা স্টপেজ পার হওয়ার পর ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'আপনি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না ম্যাডাম।'

'কে বলল বুঝতে পারছি না। বললাম না, এভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে আমার। আমি বেশ কমফোর্ট ফিল করছি এভাবে দাঁড়িয়ে যেতে।' মহিলাটি তার কাঁধে হাত রেখে কিছুটা জোর করে তাকে বসিয়ে দিলেন সিটে।

কিন্তু ঝট করে আবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর কিছুটা রূঢ় স্বরে বললেন, আরে ধুর ম্যাডাম। আপনার অতি ভদ্রতার কারণে আমি আমার বাসা তিন স্টপেজ পেছনে ফেলে এসেছি!'

সত্যি করে বলো তো, কেমন লাগল গল্পটা। ভালোবাসার গল্প বলার আগে তোমাকে আরেকটা গল্প বলি। সাত বছর ভালোবাসাবাসি করার পর বিয়ে করেছিলেন রিয়াদ ভাই আর টুম্পা আপা। কিন্তু বিয়ের দেড় বছরের মাথায় বিয়েটা ভেঙে গেল তাদের। খুব বোকা ধরনের মানুষ রিয়াদ ভাই, না হলে সাত বছর ভালোবাসাবাসি করার পর কেউ বিয়ে করে!

ব্যাপারটাতে বেশ কষ্ট পেলেন রিয়াদ ভাইয়ের বন্ধুরা। তারা সবাই একদিন তার বাসায় এলেন এবং এক বন্ধু রিয়াদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইদানীং ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আচ্ছা বল তো, এর পেছনে কী কারণ থাকতে পরে বলে তোর মনে হয়!'

রিয়াদ ভাই খুব গম্ভীর হয়ে বলেন, 'সম্ভবত বিয়ে!'

সরি, তোমাকে ভালোবাসার গল্প বলতে চেয়েছি আমি। আচ্ছা বলো তো—পারিবারিকভাবে বিয়ে আর ভালোবাসাবাসি করে বিয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? পারিবারিকভাবে বিয়ে মানে অন্যের দ্বারা খুন হওয়া আর ভালোবাসাবাসি করে বিয়ে মানে আত্মহত্যা করা। একটা মিলও রয়েছে। পারিবারিকভাবে বিয়ের পর প্রেম শুরু হয়ে, তারপর যন্ত্রণা; প্রেম করার পর বিয়ে হয়, তারপর যন্ত্রণা।

আমি সত্যি দুঃখিত, তোমাকে ভালোবাসার গল্প বলতে চেয়েছি আমি। কিন্তু কী নির্লজ্জ আমি! কিশোরী হেনা মারা যায় বর্বর পুরুষ কর্তৃক, বিচারের নামে প্রহসন; চাঁদপুরের ৬০ বছরের মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুল জলিল কর্তৃক ওই মাদ্রাসার ১১ বছরের একটি শিশুর অবৈধভাবে মা হওয়া আর সত্তরোর্ধ্ব ওই মানুষটি, সর্বস্ব দিয়ে শেয়ারবাজারে নেমে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করা চিৎকার! তারপরও ভালোবাসার গল্প! প্লিজ আসো না তার বদলে আমরা একবারের জন্য হলেও মানুষ হই, মানুষের নির্লজ্জতায় আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মহত্যা করি!

জ্ঞানদায়িনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু তালেব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'সুবেক, লাঠিতে তেল মাখাচ্ছো কেন তুমি?'

কথা বলার সময় চোখ দুটো বন্ধ করে কথা বলেন সুবেক আলী তরফদার। তার ষাট বছর বয়সী চোখে আলো একটু কমে এলেও সব মিলিয়ে তিনি ভালোই দেখেন। দূরের জিনিসগুলো যদিও ঘষা কাচের মতো মনে হয়, তবে সুইয়ে সুতা পরাতে মোটেও কষ্ট হয় না তার। মাঝে মধ্যেই এ কাজটা করতে হয় তাকে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পরনের এটা-ওটা ছিঁড়ে গেলে সেলাই তো তার নিজেরই করতে হয়। সুবেক আলী চোখ বন্ধ করলেন না, তার মানে তিনি এখন কথা বলবেন না।

আবু তালেব সাহেব আবার বললেন, 'সুবেক, কথার জবাব দিলে না যে তুমি!'

চোখ বুজে ফেললেন এবার সুবেক আলী তরফদার। কথার জবাব দেবেন তিনি। কিন্তু না, কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল, মিনিটও চলে গেল, আগের মতোই রইলেন তিনি। কেবল হাত দিয়ে ইশারা করে পাশে বসতে বললেন তাকে। মাস্টার সাহেব বসলেন না। সুবেক আলী তরফদার এবার কথা বলে উঠলেন, 'মাস্টার, তোমার আর দাঁড়ায়া থাকার অভ্যাস গেল না! একসাথে পড়তাম, পড়া তো পারতাই না, সারাক্ষণ কান ধইর‍্যা বেঞ্চির উপর দাঁড়ায়া থাকতা। এখনো দাঁড়ায়াই থাকো!'

লাঠিতে তেল মাখানো হচ্ছে!

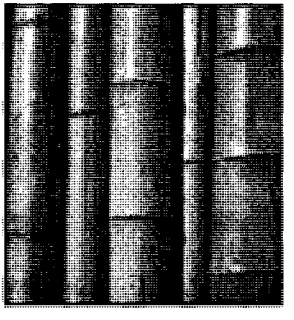

ভীত চোখে ঝট করে এদিক-ওদিক তাকালেন আবু তালেব সাহেব। না, আশপাশে কেউ নেই। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে, কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে তিনি সুবেক সাহেবের পাশে বসলেন, 'পুরাতন কথা না বললে হয় না, সুবেক?'

সুবেক সাহেব চোখ বুজেই আছেন। এক পলক তাকিয়ে আবার বন্ধ করে বললেন, 'তুমি তো জানো,

আমার কথাবার্তাই এ রকম।'

'আমি এখন একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলে আমি পড়া পারতাম না, এটা শুনলে মানুষজন ভাববে কী!'

'তোমার শরম লাগে তালেব?'

'এটা শরমের ব্যাপার না?'

'কিন্তু তোমাকে তো আমি বেশরম বলেই জানি।'

'এমন কী করলাম যে, আমি বেশরম হয়ে গেলাম!'

'কোনো কোনো বিশেষ দিনে তোমার বাড়িতে যে পতাকা টাঙ্গাও, সেটা কি মন থাইক্যাই টাঙ্গাও? আমার তো মনে হয় মন থাইক্যা টাঙ্গাও না। এই যে তুমি মন থাইক্যা টাঙ্গাও না, তাহলে কেন টাঙ্গাও? বেশরম না হলে এমন কাম কেউ করে! আমার স্পষ্ট মনে আছে, যুদ্ধে যাওনের সময় তুমি যাও নাই, আমি গেছিলাম। আমি শুনেছি, তোমার বাড়িতে আমাদের দেশের পতাকা তো তখন টাঙ্গাওই নাই, চান-তারা মার্কা পতাকা টাঙ্গায়া রাখতা। সেই তুমি এখন খোলস পাল্টায়া আমাগো দেশের পতাকা টাঙ্গাও, শরম করে না তোমার?'

'তোমাদের পতাকা মানে! আমাদের পতাকা না?'

'তুমি ওই পতাকাটাকে নিজের পতাকা মনে করো?'

খুক করে একটু কেশে মাস্টার সাহেব বললেন, 'ওসব পুরানো কাসুন্দি বাদ দাও তো, সুবেক। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করলাম তার জবাব দাও।' চোখ দুটো খুলে ফেললেন সুবেক আলী তরফদার। না, তিনি আর এখন কথা বলবেন না। মনোযোগ দিয়ে লাঠিতে তেল মাখাতে লাগলেন। মাস্টার সাহেব আলতো করে সুবেক সাহেবের গায়ে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা মেরে গা থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে সুবেক সাহেব বললেন, 'তোমাকে না কতদিন বলেছি তালেব, আমার গায়ে হাত দেবা না। তোমাকে আমার ঘেন্না করে।'

'ঘেন্না করে!'

'একজন দেশদ্রোহীরে ঘেন্না না করা তো অতি উঁচুমানের পাপ তালেব।'

'ঠিক আছে, তোমার যা মনে হয় তাই করো। এখন বলো তো দেখি, লাঠিতে তেল মাখাচ্ছো কেন তুমি?' মাস্টার সাহেব একটু কাছ ঘেঁষে বললেন, 'কোনো চোর-টোরের খোঁজ পেয়েছ নাকি?'

'চোরের আবার খোঁজ পাওয়া লাগে নাকি! সারাদেশেই তো চোর দিয়া বোঝাই।'

'তাহলে ডাকাত?

'ডাকাত তো আরও বেশি।' লাঠিতে তেল মাখা বাদ দিয়ে সুবেক আলী

তরফদার দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো দেখি, তালেব।' লাঠিটা একটু সামনে মেলে ধরে তিনি বললেন, 'এই লাঠিটা দিয়ে একটা মানুষের কোথায় বাড়ি মারলে সে মরবে না, কিন্তু সারাজীবন মনে রাখবে বাড়িটা?'

ভীত-সন্ত্রস্ত একটা ঢোক গিললেন মাস্টার সাহেব। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কাকে বাড়ি মারবে তুমি, সুবেক?'

'সেটা পরে বলছি। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমি জানি না।'

'ক্লাসে পড়া না পারার মতো সেই একই কথা বললা। আমি জানি, তুমি কিছুই জানো না। প্রতি বছর এই সময়টা এলেই দেশের সব টিভি-পত্রিকার সাংবাদিকদের দরদ উথলে পড়ে আমাদের জন্য। তারা কাঁদো কাঁদো চেহারায় টিভিতে আমাদের জন্য কথা বলে, এটা-ওটার জন্য আবেদন জানায়, পেপারে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে সাদা নিউজপ্রিন্ট ভরিয়ে ফেলে। কিন্তু সারা বছর কোনো খবর নেই। উপোস পেটে আমাদের দিন শুরু হয়, আবার সেই উপোস পেটে ঘুমাই। কই, এতগুলো বছর কেটে গেল কোনো কিছু তো হলো না। তাহলে কেন, এই দরদ উথলে ওঠা, কেন অভিনয়ের মহড়া, কেন এই প্রতারণার ফাঁদে পা রাখা, এত রঙ-ঢঙ করা। বছরের পর বছর, প্রতিবছর!' পাশে একদলা থুথু ফেলে সুবেক আলী তরফদার লাঠিটা সোজা করে ধরলেন। তারপর সমস্ত রাগ চেহারায় এনে বললেন, 'এবার যে-ই আমার কাছে কথা বলতে আসবে, সেই সাংবাদিকরেই ইচ্ছামতো পিটামু, মনের সাধ মিটায়া পিটামু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তোমারে যেভাবে পিটাইছিলাম, ঠিক সেইভাবে।'

একটি খবর শ্যামপুর-ডেমরা এলাকার জনতার ধাওয়া খেয়ে আলোচিত 'দৌড়' সালাহউদ্দিনের ক্যাডাররা এখনও দাপটে, নেতৃত্বে আছেন আওয়ামী লীগের এমপি অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম। চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব সবকিছুই চলছে আগের মতো। স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিএনপির আমলে ছিল তখনকার এমপি সালাহউদ্দিনের সন্ত্রাস, এখন এমপি সানজিদার।

—সমকাল, ১ম পৃষ্ঠা, ২৪ মার্চ, ২০১১

খবরটা পড়েই আপনি ভেবে বসেছেন—এটা আর নতুন কী! এরকম তো অহরহই হচ্ছে, প্রতিনিয়তই ঘটছে। এরপর মুখ বিকৃত করে অস্ফুট স্বরে গালিও দিয়ে বসেছেন একটা। কিন্তু আমি বলি কি, ওই যে কথায় আছে না, ভালোর পেছনে যেমন খারাপ থাকে, তেমনি খারাপের পেছনে ভালোও থাকে। চিন্তা করে দেখুন, সালাহউদ্দিন সাহেব যে মাস্তানগুলো পুষতেন, তিনি ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তারা একরকম বেকারই হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় বেওয়ারিশের মতো ঘুরত, দড়ি ছাড়া গরুর মতো এর-ওর এখানে-ওখানে হাত লাগাত, অভিভাবকহীন সন্তানের মতো উচ্ছন্ন হয়ে জীবনকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। ঠিক সেই সময়ে কিনা সানজিদা ম্যাডাম তাদের ডেকে নিয়ে, ড্রইংরুমে চা-বিস্কুট খাইয়ে, দেবদূতের মতো বলেছিলেন, 'ওরে, ওরে আমার সূর্যসন্তানরা, হতাশ কেন তোমরা! হাসো, মানুষকে হাসাও। আমাকেও। তোমরা বীরবিক্রমে আগে যা করতে, এখনও তা-ই করবে। আগে সালাহউদ্দিন সাহেব তোমাদের যা দিত আমিও তোমাদের তা-ই দেব। তোমরা আমার ভাই-বেরাদর, সন্তানের মতো। তোমরা কষ্টে থাকলে আমি কি ভালো থাকি! তোমরা বেকার থাকলে সমাজ চলবে কী করে!'

সানজিদা ম্যাডাম জিন্দাবাদ!

এবার ভাবুন, সানজিদা ম্যাডাম ঠিক বলেছিলেন কি-না। আরে ভাই, ওরা মাস্তান হলেও, দুশ্চরিত্র হলেও, সন্ত্রাসী হলেও, ওদের তো বউ-বাচ্চা আছে, ছেলেমেয়ে আছে, ওইসব বউ-বাচ্চা, ছেলেমেয়ের পেট আছে, জীবন বাঁচাতে সেই পেট ভরাতে হয়, সম্ভ্রম রক্ষা করতে কাপড়চোপড় কিনতে হয়, শীতের দিনে ঠোঁট ফেটে গেলে ভেসলিন কিনতে হয়, গরমে ফ্যানের বাতাসের কারেন্টের বিল দিতে হয়, জুতা কিনতে হয়, টিভি কিনতে হয়, মোবাইল কিনতে হয়। জীবনকে সাজাতে কত কিছুর আয়োজন করতে হয়। আর এসবের অতি উত্তম ব্যবস্থা দয়া করে সানজিদা ম্যাডাম করে দিয়েছেন, তার এলাকার নষ্ট হতে যাওয়া এসব প্রাণোচ্ছল যুবককে আশ্রয় দিয়েছেন, এতে কার বাড়া ভাতে ছাই পড়ল! মানুষই তো মানুষের উপকারে আসে, নাকি! তার এলাকার লোকজন যদি বেকার থেকে রাস্তা-ঘাটের চার পা-ওয়ালা প্রাণীর মতো শুয়ে-বসে কাটায়, তাহলে কি সেটা ভালো দেখায়!

সুতরাং আমি মনে করি, সানজিদা ম্যাডাম যা করেছেন, তা খুবই ভালো করেছেন, মানবতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শীর্ষ সন্ত্রাসী হলেও কি তারা মানুষ না!

এবার আসুন জায়গা দখল প্রসঙ্গে। আফ্রিকার পড়ে থাকা জায়গা লিজ নিয়ে ফসল ফলানোর চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। আমাদের এই বাংলাদেশেই তো কত জায়গা পড়ে আছে। সেই সব জায়গার উর্বর মাটিগুলো হা-পিত্যেশ করছে—আমার বুকে ফসল ফলাও, আমার বুকে ফসল ফলাও। সানজিদা ম্যাডাম সেই জায়গা তো দখল করেন নাই। তিনি সেই জায়গাগুলোর সদ্ব্যবহার করছেন। তিনি চারপাশে বেড়া দিয়ে, তাতে কম্পোস্ট সার মিশিয়ে, তার মাঝে লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, লাউ, কুমড়ো, টমেটো চাষের ব্যবস্থা করেছেন। এতে লাভ ছাড়া কোনো ক্ষতি দেখছি না। অর্থকরী ফসল ফলিয়ে দেশের অর্থ বাড়াচ্ছেন তিনি, এটা তো খুবই ভালো কথা। পড়ে থাকা জায়গাগুলোতে দালান তুলে মানুষের থাকার ব্যবস্থা করছেন, এটা তো অতীব মানবিক গুণাবলি। রাস্তার পাশে দোকান তুলে মানুষকে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছেন, এর চেয়ে উত্তম কাজ আর কী হতে পারে!

সানজিদা ম্যাডামের কর্মকাণ্ডের দিকে ভালো করে তাকান, দেখবেন তিনি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য কত রকম চেষ্টাই না করছেন। প্রতিটা এলাকার একটা ঐতিহ্য থাকে, প্রতিটা ক্ষমতাবানের নিজস্ব কিছু চিন্তা-চেতনা থাকে। চাঁদার মতো সংস্কৃতিকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ব্যবহার করে নিজেকে সমৃদ্ধিশালী করার পথ আগলে রেখেছেন, দেশের কাজের জন্য দায়িত্ববান ঠিকাদারদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ নেওয়ার রেওয়াজ-রীতি বজায় রেখেছেন। তিনি তো আসলে তার পূর্বসূরিদের পথেই হেঁটে বেড়াচ্ছেন, তিনি তো তার মুরব্বিদের

দেখিয়ে দেওয়া কাজগুলোই বজায় রেখেছেন। এতে অন্যায় কোথায়? ওই যে কথায় আছে না—মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন...।

আমাদের বাঙালিদের একটা বাজে স্বভাব আছে—কেউ ভালো থাকলে তার বিরোধিতা করা, তাকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলা। ঈর্ষা আর কি! হিংসা তো বটেই। সানজিদা ম্যাডাম ভালো আছেন, এটা তার আশপাশের কিছু খারাপ মানুষের সহ্য হচ্ছে না। তারা তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যাচার করছে, অভিযোগ করছে। এটা ঠিক না, এটা মানবতার চরম স্খলন।

আমি তাই বলি কি—মানবতার এতরকম পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য সানজিদা ম্যাডামকে পুরস্কৃত করা উচিত। তাকে এটা-সেটা পুরস্কার নয়, আর কিছু না হোক শান্তিতে একটা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা উচিত; যদি তিনি এ পুরস্কার নিতে স্বীকৃতি জানান। কারণ, নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসকে নিয়ে যা করা হচ্ছে, তাতে তিনি এ পুরস্কার গ্রহণ করবেন কি-না, তা নিয়ে আমি সন্দেহে আছি।

নোবেল তিনি পান অথবা না পান, আসল পুরস্কার তিনি ঠিকই পাবেন। ইনশাআল্লাহ আগামী ইলেকশনেও তিনি নমিনেশন পাবেন, এমনকি বিজয়ীও হতে পারেন। কারণ আমাদের মতো ছাগল শ্রেণীর পাবলিকরাই আবার তাকে ভোট দেব, জয়যুক্ত করে তার গলায় মালা ঝোলাব, এরপর নির্লজ্জের মতো গলা ফাটিয়ে বলব—সানজিদা আপার চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র!

গোপন কথা কাকে বলে জানো? আমি জানি, তুমিও। কিন্তু তুমি যেটা জানো, সেটা এখন অচল। গোপন কথা হচ্ছে সেটা—তোমার সম্বন্ধে যেটা তুমি নিজে জানো না, কিন্তু সারাদেশের মানুষ তা জানে! যেমন প্রভা কিংবা চৈতীর গোপন ভিডিওর খবর প্রথমে তারা জানত না, সারাদেশের মানুষ তা জানত।

গোপন একটা কথা বলব আজ তোমাকে, খুব গোপন কথা। তার আগে বলো তো—সাফল্য আর সার্থকতার মধ্যে পার্থক্য কী? ফুলের অনেক বৈচিত্র্য বা রঙের জৌলুস আছে, এগুলো তার সাফল্য। কিন্তু যে গন্ধ দিয়ে সে আমাদের মন ভোলায়, তা হলো তার সার্থকতা। কথাটা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের।

এবার বলো তো—ভোগ কাকে বলে আর উপভোগ কাকে বলে? পারবে না? ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি। ধরো, বাজার থেকে বড় একটা কেক এনে তুমি একাই সবটুকু খেয়ে ফেললে, এটাকে বলে ভোগ। আর ওই কেকটা যদি কয়েকজন মিলে খেয়ে ফেল, তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য উপভোগ। ভোগ আর উপভোগের মধ্যে উপভোগ কিন্তু সুশীল, শোভন, ভদ্র, শিষ্টময়। সুতরাং আমাদের সবারই উপভোগ কাম্য, ভোগ নয়।

সম্ভবত কৌতুকটা তুমি শুনেছ। হোক না পুরনো, সেটাকে নাম-টাম পাল্টিয়ে বলছি, আমার বিশ্বাস, এবারও হাসি পাবে তোমার। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে গো-হারার পর বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের কেউই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না। বাসায় লুকিয়ে আছে সবাই। কিন্তু কয়দিন আর এভাবে লুকিয়ে থাকা যায়। একসময় অস্থির হয়ে দারুন একটা মেকআপ নিল তামিম ইকবাল। দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে বের হয়ে এলো রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূর আসার পর কে যেন ডেকে উঠল, 'ওই তামিম, কই যাস?'

প্রচণ্ড অবাক হয়ে তামিম পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, এক মহিলা তার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে

তোমার গোপন কথাটি

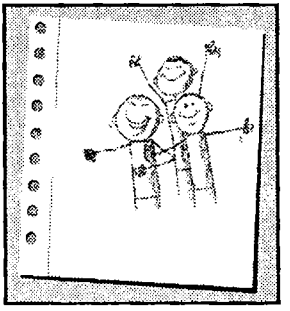

আসছে। মহিলাকে দেখে তামিম আরও অবাক হলো। এত ভালো করে সে মেকআপ নিল আর তার মধ্যে মহিলাটি চিনে ফেলল তাকে! মহিলার দৃষ্টি শক্তির প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু মহিলাটি কাছে আসার আগেই সে দ্রুত পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বাসায় ফিরে ভাবতে লাগল তামিম—মহিলা তাকে চিনল কী করে? ভাবতে ভাবতেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, বাসায় যেহেতু বসে থাকা যাচ্ছে না, বের যেহেতু হতেই হবে, তাহলে অন্যরকম একটা মেকআপ নিয়ে বের হতে হবে। যে-ই ভাবা সে-ই কাজ। পরদিন তামিম সুন্দর একটা মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ আর পরচুলা পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল। না, তাকে আজ কেউই চিনতে পারবে না। নির্বিঘ্নে সে বাইরে ঘুরতে পারবে।

ফুরফুরে একটা মন নিয়ে বাসার বাইরে বের হলো তামিম। না, কেউই তাকে চিনতে পারছে না। অন্যান্য মেয়ের মতো স্বাধীনভাবে হেঁটে যাচ্ছে সে। সামনে ব্রিজের ওপর কয়েকটা ছেলে বসে আছে। তাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেও আবার হাঁটতে লাগল সে। ভয় পেতে লাগল, তাদের মধ্যে কেউ চিনে না ফেলে! কিন্তু না, তাকে দেখেই একটা ছেলে শিস বাজাল, একটা ছেলে টিজ করল। এই ইভ টিজারদের জন্য একটু খারাপ লাগলেও স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে—যাক, তাকে আজ কোনোভাবেই কেউ চিনতে পারবে না। কিন্তু আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পর তাকে আগের দিনের মতো ওই মহিলাটি ডেকে উঠল, 'ওই তামিম, কই যাস?' তামিম আজ আরও বেশি করে অবাক হলো। রাস্তার কেউ তাকে চিনতে পারল না, কিন্তু এই মহিলাটি আগের দিনের মতো আজও চিনে ফেলল! এবার সে নিজেই মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাকে ফিসফিস করে বলল, 'আচ্ছা, আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

মহিলাটি অবাক হয়ে বললেন, 'আমি সাকিব আল হাসান।'

কী, একটু মন ভালো হয়েছে তোমার? বিশ্বকাপ নিয়ে তোমার যে একটা গোপন কষ্ট ছিল, দূর হয়েছে সেটা?

এবার একটু হাসো তো, প্লিজ। দাঁড়াও, তার আগে একটা কৌতুক বলে নিই।

মতিন খুব আন্তরিকভাবে তার বন্ধু সোহেলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর আর মলির দীর্ঘদিনের প্রেমটা ভেঙে গেল কেন, বল তো?' সোহেল দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'গোপন একটা কারণ আছে।'

'বলা যাবে সেই গোপন কারণটা?'

'হ্যাঁ।' সোহেল একটু থেমে বলল, 'আমার তেমন টাকা-পয়সা নেই, ও তাই আমাকে বিয়ে করতে চায়নি।'

'তোর না থাক, তোর এক চাচা তো বিরাট ধনী, তার কথা বলিসনি?'

'বলেছিলাম। তার কয়েকদিন পরেই ও আমার চাচি হয়েছে।'

কী, আরও একটু হাসি পেল?

সাংসদ-মন্ত্রীদের কয়দিন আগে সম্পদের হিসাব দিতে বলা হয়েছে; কিন্তু এ-ও বলা হয়েছে, সেই সম্পদের তালিকা গোপন রাখা হবে। শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, সেখানেও বলা হয়েছে কেলেঙ্কারিদের নাম গোপন রাখা হবে।

কী, এবার কি একটু বেশি হাসি পেল তোমার?

কিছুটা বিরক্তি নিয়ে সালেহীন বললেন, 'বস, শরীরে জং ধরে গেছে, আর তো বসে থাকতে ভালো লাগছে না। হাতও নিশপিশ করছে।'

পাউরুটিতে মাখন মাখাচ্ছিলেন বস। সালেহীনের কথার কোনো জবাব দিলেন না তিনি। আগের মতোই মাখন মাখাতে লাগলেন। মাখন খুব পছন্দ করেন বস। তবে মাখন তো এমনি এমনি খাওয়া যায় না। পাউরুটি কিংবা অন্য কিছুর সঙ্গে মেখে খেতে হয়। বস তাই পাউরুটিতে মাখাচ্ছেন। কিন্তু বসের একটা অদ্ভূত অভ্যাস আছে—মাখন মাখানো পাউরুটি তিনি চায়ে চুবিয়ে খান, তবে সেটা দুধ চা না, খাঁটি লিকার চা।

সালেহীন এবার একটু শব্দ করে বলল, 'বস, আপনি আমার কথাটা শুনতে পেয়েছেন? শরীর কিন্তু পাথর হয়ে যাচ্ছে। কতদিন হাতটা বেকার পড়ে আছে!'

পাউরুটির একটা টুকরো মুখে দিয়ে বস সালেহীনের দিকে তাকালেন, 'খুব বেশি দিন তো হয়নি সালেহীন! এই তো কয়েকদিন আগে একটা অপারেশন করে এলে।'

'কয়দিন আগে মানে তো অনেকদিন হয়ে গেছে বস, তাও—।' কয়দিন হয়েছে সেটা বের করার জন্য সালেহীন একটু ভেবে বললেন, 'তাও তো দশ-বারো দিন হয়ে গেছে।'

বস আরও এক টুকরা পাউরুটি চায়ে চুবালেন, কিন্তু সেটা মুখে না দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকিয়ে রইলেন সালেহীনের দিকে। ভেজা পাউরুটির একটা অংশ টুপ করে নিচে পড়ে গেল। বস তবুও তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'কয়দিন ধরে একটা জায়গায় যাওয়ার কথা আমাদের। হাইকমান্ড নির্দেশ দিয়েছে। তা যাবে নাকি আজকে? দেখি, কিছু একটা পাওয়া যায় কি-না।'

দুর্ঘটনা

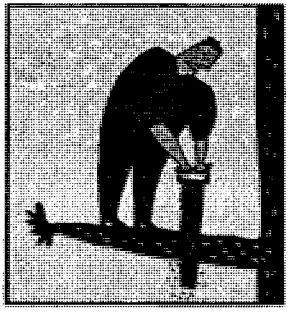

লাফ দিয়ে ওঠেন সালেহীন। পাশে রাখা পিস্তলটা কোমরে গুঁজে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বস, এখনই চলেন, দেরি করে লাভ কী!'

বস ভেজা পাউরুটিটা মুখের ভেতর চালান করে দিয়ে বললেন, 'এখন তো সন্ধ্যা। রাতেই তো যেতে হয় আমাদের। রাতের অন্ধকারেই যা কিছু করে একটা কিছু বলে দেওয়া যায়।'

সাড়ে চার ঘন্টা পর, সালেহীন এবং আরও তিনজন মিলে রওনা দিলেন নিদিষ্ট এলাকায়। সোর্স বলেছে, মাদক ব্যবসাসহ অনেক কিছুই হয় এখানে। সারাদেশের সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয় এ জায়গাটাই প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা না একটা অঘটন ঘটেই এখানে। কিন্তু এত রাতে এসেও কাউকে খুঁজে পেলেন না তারা। ফিরে আসার জন্য প্রস্তুতি নিলেন বস।

বেশ কিছুদূর আসার পর সালেহীন মন খারাপ করে বললেন, 'বস, এতদিন পরে এসেও খালি হাতে ফেরত যাব!'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

'একটা কাজ করি বস?'

'কী?'

'ওই যে একটা ছেলেকে আসতে দেখছি, নিরীহ টাইপের ছেলে। হাতটা বড়ই নিশপিশ করছে বস। একেবারে বুক বরাবর না মেরে পায়ে একটা মেরে দিই। বুকের ভেতর উথাল-পাথাল করছে।' বলতে বলতে কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে নিলেন সালেহীন।

বস মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার যখন শখ করেছে।' সালেহীন নিরীহ ছেলেটাকে কাছে ডেকে তার পায়ে একটা গুলি মেরে মুচকি হাসতে থাকেন। তার হাতের নিশপিশ ভাবটা কমে এসেছে। অনেক দিনের অভ্যাস তো, ব্যাপারটা নেশার মতো হয়ে গেছে। গুলিটা করার পর বেশ আরাম লাগছে।

প্রিয় পাঠক, দয়া করে ওপরের কাল্পনিক গল্পের সঙ্গে র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো লিমনের ঘটনাকে মিলিয়ে দেখবেন না। প্লিজ।

একটি ঈশপের গল্প, সঙ্গে আরও একটু

একটা নেকড়ে নদীতে পানি খেতে এসে দেখে একটু দূরে একটা ভেড়াও পানি খাচ্ছে। মনে মনে নেকড়ে ভাবল, ভেড়াটাকে খাওয়া যায় কীভাবে। একটু ভেবে সে ভেড়ার কাছে গিয়ে বলল, 'দেখছিস না আমি পানি খাচ্ছি, ওভাবে পানি ঘোলা করছিস কেন?'

ভেড়া ভয়ে জড়সড় হয়ে বলল, 'আমি তো পানি ঘোলা করছি না। তা ছাড়া স্রোত তো অন্যদিকে যাচ্ছে, আপনার দিকে যাচ্ছে না।' নেকড়ে একটু ভেবে বলল,

'তুই ঘোলা না করলেও তোর বাবা নিশ্চয় করেছিল। সুতরাং শাস্তি হিসেবে তোকে আমি খাব।' বলেই নেকড়েটা ভেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে খেতে লাগল।

পাশ দিয়ে একটা সিংহ যাচ্ছিল। মৃত ভেড়াকে দেখে নেকড়েকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর এ অবস্থা কেন?' নেকড়ে কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'ও আসলে ঘটনার শিকার, রাজা মশাই!'

প্রিয় পাঠক, লিমনকে সন্ত্রাসী বলে দাবি করার ১৯ দিন পর র‍্যাবের মহাপরিচালক বক্তব্য দিয়েছেন—লিমন সন্ত্রাসী নয়, ঘটনার শিকার। দয়া করে 'ঘটনার শিকার' সংক্রান্ত দুটি বক্তব্যকে এক করে দেখবেন না। প্লিজ।

গিয়াস উদ্দিন আল মামুন নিবেদিত, খাম্বা প্রোডাকশন প্রযোজিত, আম-জনতা অভিনীত, অ্যাকশন, সাসপেন্স আর ক্লাইমেক্স নিয়ে একটি সুপারহিট মাল্টি মুভি 'কারেন্ট থাকে না আন্ধার রাইতে— 'The Black'. নয় বছর আগে নির্মিত এই সিনেমায় কী আছে? কারেন্ট যায়, না মাঝে মাঝে আসে, এই থিম নিয়ে নির্মিত ছবিটা আপনারা কেন দেখবেন? তার আগে চলুন সিনেমার কাহিনীটা আসলে কী—

বাসার আলীর একদিন ঘুম ভেঙে যায় মাঝ রাতে। বিদ্যুৎ ছিল না তখন, কিন্তু মনে করেন অন্ধ হয়ে গেছেন তিনি। কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, ঘরের কোণায় যে লাল টকটকে ডিম লাইট ছিল, সেটাও না। প্রচণ্ড পানির পিপাসা লেগেছে, পানি খাওয়া দরকার। টকটকে গরম পড়েছে, বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে তার। স্ত্রীকে ভয় পান তিনি, কারণ তিনি ভদ্রলোক। তাই ডাকতে সাহস হচ্ছে না তাকে। অগত্যা তিনি একাই বিছানা থেকে নামলেন। অন্ধের মতো হাতড়ে হাঁতড়ে ডাইনিং রুমে গেলেন। হঠাৎ ভীষণ একটা মেয়েলি চিৎকার—বাঁ-চা-ও। মেয়েটি কে? কেন এই মেয়েলি চিৎকার? না ভাই, অন্য কিছু ভাববেন না। নিজেকে অন্ধ মনে করা বাসার আলী ডাইনিং রুমে শুয়ে থাকা কাজের মেয়ের গায়ে ভুলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন। আর সারাক্ষণ হিন্দি সিরিয়াল দেখা কাজের মেয়েটা আধো স্বপ্ন, আধো জাগরণে মনে করেছিল হিন্দি সিরিয়ালের ভিলেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাই তার এই অন্তিম চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে বাসার আলীর স্ত্রী দৌড়ে আসেন বেডরুম থেকে। অন্ধকারে দু'জনকে দেখে তিনিও চিৎকার করে ওঠেন। তারপর? হ্যাঁ ভাই, সেটা জানার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

হাঁ ভাই
আসিতেছে...

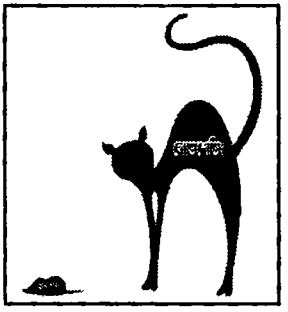

বিদ্যুৎ চলে গেছে? গরমে মেজাজ চরমে উঠেছে?

এক সেকেন্ড! আলোয় ভরিয়ে দেবে আপনার ঘর, মন, হৃদয়।

করিম আইপিএস, অন্ধকারে চান্দের আলো। [বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত]

সুধী দর্শক-শ্রোতাবৃন্দ, বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম। আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই আছেন। হ্যাঁ ভাই, বাসার আলী ভয় ভয় গলায় পানি খাওয়ার কথা বলতেই তার স্ত্রী আগের চেয়ে জোরে চিৎকার করে বললেন, 'পানি পাবে কোথায় ? কারেন্ট না থাকলে পাম্প চলে না, পাম্প না চললে পানি আসে না। এটা জানো না? পানির বদলে নিজের আঙ্গুল চোষো।' প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আরও একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি। আগের মতোই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

পানি নিয়ে ভাবনা?

আর না আর না। আছে জীবন বাঁচানো হোয়াইট পানি। এক বোতল মাত্র ১০ টাকা।

হোয়াইট পানি, এক চুমুকেই কলিজা ভেজে। [ওয়াসার আশীর্বাদপুষ্ট একটি জীবাণুমুক্ত প্রতিষ্ঠান]

আবার ফিরে এলাম দর্শক-শ্রোতামণ্ডলী। মনের দুঃখে বাসার আলী ভয় ভয় গলায় স্ত্রীকে বললেন, 'পানি না দাও, এক কাপ চা দাও না।' বাসার আলীর স্ত্রী আগের চেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'মিনসের আক্কেলের ছিরি দ্যাখো! গ্যাসের অভাবে ভাত খাওয়া ছেড়ে চাউল খাচ্ছি আমরা, আর উনি খাবেন চা। বলি, চা বানাতে আগুন লাগে, আগুন জ্বালাতে গ্যাস লাগে। বুঝেছো?' শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলী আরও একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি। আমাদের সঙ্গে থাকবেন কিন্তু।

আপনার বাসায় গ্যাস নেই?

নো চিন্তা। ১০০ ভাগ গ্যাসের সারাদেশে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত মাত্র ১০ ভাগ গ্যাস কর্তৃপক্ষ দিতে না পারলেও আমরা দেব।

নবধারা এলপি গ্যাস, বুকের আগুনের চেয়ে বেশি আঁচ। [পেট্রোবাংলার পার্সেন্টেজে পরিচালিত]

প্রিয় শ্রোতা আর দর্শক, আবার ফিরে এলাম। পানি, চা, কোনোটাই না পেয়ে বাসার আলী মনের দুঃখে বাসার বাইরে বের হলেন। কিন্তু তার খেয়াল ছিল না এই বর্ষাকালে প্রতিবছরের মতো ওয়াসা-টিঅ্যান্ডটি আর সিটি কর্পোরেশন মিলে মনের আনন্দে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করছে এবং তার বাসার সামনে বিশাল একটা গর্ত। কয়েক পা এগোনোর পর বাসার আলী নিজেই একটা চিৎকার দিলেন, 'আল্লা রে...!' সুধী দর্শকবৃন্দ, তারপর? তারপর কী হলো? তা জানতে পারবেন ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর।

রাস্তায় গর্ত? পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে?

বর্ষাকাল শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি। তাই নিরাপদে পথ চলতে আপনার দরকার ডিজিটাল প্যারাস্যুট।

ডিজিটাল প্যারাস্যুট, এক লাফেতে রাস্তা পার। [টিএন্ডটি, ওয়াসা এবং সিটি কর্পোরেশনের একটি পণ্য]

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী, একটা সুখবর আছে আপনাদের জন্য। বাসার আলীকে নিয়ে সুপারহিট মাল্টি মুভি 'কারেন্ট থাকে না আন্ধার রাইতে—The Black' রঙিনভাবে নির্মিত হচ্ছে। দুই বছর আগে শুরু হওয়া এ ছবিটি নির্মাণ করা হবে ডিজিটাল ফরম্যাটে। এক ঘণ্টা কারেন্ট থাকবে আরেক ঘণ্টা থাকবে না—এই থিম নিয়ে নতুনভাবে নির্মিত হবে ছবিটি, যার আভাস আপনারা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। আপনারা প্রতিদিন জীবন উপভোগ করুন, আন্ধার ঘরে বসে মশার গান শুনুন, বারান্দায় বসে ফকফকা চান্দ দেখুন। স্বাগতম 'কারেন্ট থাকে না আন্ধার রাইতে– The Black. [সম্পূর্ণ রঙিন] মুভিতে।

রেডিওর ঘোষিকা : আপনারা এতক্ষণ 'কারেন্ট থাকে না আন্ধার রাইতে'—'The Black' [সম্পূর্ণ রঙিন] মুভির বিজ্ঞাপনী প্রচার শুনলেন। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা মহানুভবতার কথা শুনুন।

সারাদেশের মানুষ কেমন আছে এটা বোঝার জন্য ঢাকার মাঝেই মিরপুরের একটা বাসায় এলেন আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী। এসেই দেখলেন বিদ্যুৎ নেই। অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি, তবু বিদ্যুৎ আসার নাম-গন্ধ নেই। বারান্দায় এসে বসলেন তিনি। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকালেন—চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার চাঁদ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তেমন ভোজনরসিক নন, তাই সুকান্তের পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি না ভেবে প্রচণ্ড গরমে এমনি এমনি হাত বাড়ালেন আকাশের দিকে। আহারে, চাঁদটা যদি এখন পেড়ে আনা যেত, তাহলে তাল পাতার মতো পাখা বানিয়ে বাতাস খাওয়া যেত! পরানটা ঠাণ্ডা করা যেত! পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, সাধারণ মানুষের মতো সব ক্ষমতাবানদের বাসায়ও এক ঘণ্টা পরপর বিদ্যুৎ দেবেন তিনি। কথাটা ভাবতেই আনন্দ-জলে ভিজে উঠল তাঁর দুটি চোখ!

চারটা দেশি মুরগি, দুটি রাজহাঁস, নয় কেজি ওজনের একটি রুই মাছ, সাড়ে চার কেজি ওজনের দুটি পদ্মার ইলিশ, আট কেজি গরুর মাংস এনে যখন বাসায় ফিরলেন, সিদ্ধান্তটা তখনই নিয়ে ফেললেন হাফিজ সাহেব। তার বড় মেয়ে লুবনা কিছুটা দৌড়ে এসে জিনিসগুলো দেখে বলল, 'ড্যাড, খাসির মাংস আনোনি!'

'সরি, ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেলে তো চলবে না। খাসির মাংস দিয়ে আমি অন্যরকম একটা আইটেম বানাবো। কিছুটা থাই ফুড ধাঁচের।'

জিনিসগুলো রেখে আবার বাজারের দিকে পা বাড়াতেই ছোট মেয়ে টুম্পা এসে বলল, 'পাপা, তোমার না আইসক্রিম আনার কথা। কই?'

'আইসক্রিম আনার কথাও ভুলে গেছি।'

টুম্পা গম্ভীর গলায় বলল, 'আইসক্রিম দিয়ে আমি একটা জুস বানাব, পাপা। কাইলি ক্যাং নামে এক চায়নিজ মহিলা আছেন না, ওই যে টিভিতে হরেকরকম খাবার বানানো শেখান, তিনি একদিন একটা জুস বানানো শেখাচ্ছিলেন। আমি দেখেছি। আইসক্রিম দিয়ে আমি আজ সে রকম একটা জুস বানাব।'

'ঠিক আছে, আমি আবার বাজারে যাচ্ছি। আইসক্রিম নিয়ে আসছি।'

হাফিজ সাহেব আবার বাজারের দিকে পা বাড়ালেন। বাইরের গেটের কাছে আসতেই একমাত্র ছেলে বাপ্পী এসে বলল, 'বাব্‌স, তুমি কি বেলুন আর জরির মালাগুলো নিয়ে এসেছ?'

'সরি বাব্‌স, আমি এগুলো আনতেও ভুলে গেছি।'

'তাহলে ঘর সাজাব কীভাবে!' কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বাপ্পী বলল।

'আমি তো আবার বাজারে যাচ্ছি। এবার নিয়ে আসব।'

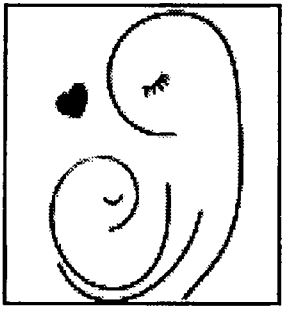

'আরো একটা জিনিস আনতে হবে বাব্‌স।'

'কী?'

'নতুন একটা সিডি বের হয়েছে, ওই সিডিটা আনতে হবে। ওটা না আনলে কিন্তু কোনো মজা হবে না বাব্‌স। মিউজিক ছাড়া কোনো মজা আছে নাকি!' গান শোনার যন্ত্রটা কানের ভেতর দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল বাপ্পী।

দেড় ঘণ্টা পর হাফিজ সাহেব সব কিছু কিনে এনে বাসায় ফিরলেন। লুবনা খাসির মাংস পেয়ে খুশি, সে সেটা দিয়ে তার মতো করে অন্যরকম আইটেম বানাতে লেগে গেল। টুম্পা আইসক্রিমের জুস বানানোর জন্য ব্ল্যান্ডার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেলুন আর জরির মালা নিয়ে ঘর সাজাতে লাগল বাপ্পী। তার আগে সিডিতে গান বাজিয়ে দিল সে।

সব আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর লুবনা বলল, 'একটু পর আমরা খেতে বসব। তার আগে কেকটা কাটব আমরা।'

হাফিজ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'কেক আবার আনল কে?'

লুবনা, টুম্পা আর বাপ্পী প্রায় এক সঙ্গে বলল, 'আমরা। আমরা আমাদের টাকা জমিয়ে—।' লুবনা টেবিলের ওপর রাখা বড় বক্সটা খুলে কেকটা বের করে বলল, 'এই কেকটা এনেছি।'

কেক কাটার জন্য সবাই ঘিরে দাঁড়াল। কাজের বুয়া দুটোও এলো এবং যার জন্য এই কেক আনা সেই জয়িতা খানমও এলেন। মায়ের হাতে জোর করে কেক কাটার ছুরিটা তুলে দিল লুবনা। জয়িতা খানম কেকটাতে ছুরি বসাতেই সবাই হাত তালি দিতে দিতে বলতে লাগলেন—'হ্যাপি মাদারস ডে টু ইউ, হ্যাপি মাদারস ডে টু মাম।' খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর হাফিজ সাহেব তার দুই মেয়ে আর ছেলেটকে তার ঘরে ডাকলেন। সবাই আসার পর বসতে বললেন সামনের সোফাতে। তারপর সবার হাতে কাগজ আর কলম তুলে দিয়ে বললেন, 'আমি একটা করে প্রশ্ন করব তোমাদের, তোমরা যার যার মতো কারোটা না দেখে উত্তরটা কাগজে লিখবে।' হাফিজ সাহেব একটু থেমে বললেন, 'বলো তো, তোমাদের মামের প্রিয় ফল কোনটি?' সবাই যার যার মতো লিখল। হাফিজ সাহেব দ্বিতীয় প্রশ্নটি করলেন, 'তোমাদের মাম কোন মাছটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন?' আগের মতোই সবাই মনোযোগ দিয়ে লিখল। 'এবার বলো তো, তোমার মামের জন্মদিন কবে?' হাফিজ সাহেব সবার দিকে তাকালেন। সবাই কেমন যেন পরীক্ষার প্রশ্ন না পারার ভঙ্গিতে লিখল। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'তোমাদের মামের সবচেয়ে বড় দুঃখ কোনটি?' এ প্রশ্নটা কেউ লিখতে পারল না। হাফিজ সাহেব আগের মতোই মৃদু হেসে বললেন, 'বড় সুখ?' এটাও লিখতে পারল না তারা।

বেশ কিছুক্ষণ পর হাফিজ সাহেব ছেলেমেয়ের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে পড়ে দেখে বললেন, 'তোমরা তিনজনে তিন ধরনের ফলের নাম লিখেছ, কিন্তু কোনোটাই হয়নি। তোমাদের মাম অন্য একটা ফল পছন্দ করেন। মাছের নামও ঠিক হয়নি। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, তোমার মাম তোমাদের জন্মদিন এত আনন্দ দিয়ে উদযাপন করেন আর সেই তোমরা তার জন্ম তারিখ জানো না! তার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো—তোমরা তোমাদের মতো বড় হচ্ছ, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছ। আর তার সুখটি হচ্ছে—আমরা তোমাদের আগের মতোই ভালোবেসে যাচ্ছি, ভালোবেসে যেতে পারছি। আত্মিকতা, সম্পর্ক, বন্ধনের মাঝে যে বাণিজ্যিকরণ এসে গেছে, সেখান থেকে এই মাদারস ডে পালনটাও ভিন্ন কিছু না। আচ্ছা, তোমরা গত এক বছরে তোমার মামের পাশে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসেছ? তার হাত ধরে মমতা নিয়ে জানতে চেয়েছ—মাম, তুমি কেমন আছ?'

আসুন, এক ডজন পাঞ্জাবি কিনে রাখি

প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা কোনো শপিং মলে যাই। ভালো কোনো দোকানে গিয়ে এক ডজন পাঞ্জাবি কিনি। ভাবছেন, ঈদ তো সেই অনেক দূরে, হঠাৎ পাঞ্জাবি কেন? আরে ভাই, পাঞ্জাবি কি কেবল মানুষ ঈদেই কেনে, অন্য কোনো সময় কেনে না? আপাতত ভাবনা-টাবনা বাদ দিই, আগে পাঞ্জাবি কিনি।

মনে রাখবেন, যেই-সেই পাঞ্জাবি কিনব না আমরা। আদি সুতির পাঞ্জাবি কিনব। গরদ, সিল্ক, মটকা—কত রকম কাপড়ের পাঞ্জাবি আছে। আমরা কিনব ফিনফিনে সাদা কাপড়ের সুতি পাঞ্জাবি। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও যেটা খুবই আরামদায়ক, স্বস্তিকর। তাছাড়া প্রচলিত ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য এ ধরনের পাঞ্জাবিই পরতে হয়। ভূমিকা অনুযায়ী এ ধরনের পাঞ্জাবি পরাই মানানসই। রাজা-বাদশার অভিনয় করতে হলে যেমন লাল-নীল রঙের ঝলমলে পোশাক পরতে হয়, পণ্ডিত মশাইয়ের অভিনয় করতে যেমন ধুতি পরতে হয়, অফিসের বসের অভিনয় করতে স্যুট-টাই পরতে হয়, ঠিক তেমনি যার জন্য এই পাঞ্জাবি কিনব তার এই পাঞ্জাবিই দরকার। অন্তত বিশেষ মুহূর্তের জন্য; বাকি সময় তিনি অন্য পোশাক পরেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেন।

পাঞ্জাবি কেনার পর আমরা স্যান্ডো গেঞ্জি কিনব। কারণ এ রকম সাদা ফিনফিনে পাঞ্জাবির নিচে স্যান্ডো গেঞ্জি পরার নিয়ম। তা না হলে শরীরের সবকিছু দেখা যাবে যে! বিশেষ করে বুকটা। আর এই বুকটা দেখা গেলেই তো প্রচণ্ড অসুবিধা। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ তার বুক দ্বারা পরিচালিত, বুকের ভেতর যে বুদ্বুদ আবেগ তৈরি হয় তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের বুকটাই হচ্ছে আসল জায়গা, যার প্রতিফলন ঘটে আচার-আচরণ এবং ব্যবহারে! সেই বুকটা কেউ দেখতে পাক সেটা তো অনেকেই চায় না, যদি সেটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে থাকে, পাখির ভাঙা বাসার মতো জঞ্জালময় হয়! পাঞ্জাবির কাপড়টাও সুতি হলে ভালো হয়, পপলিনের হলে আরও ভালো।

এবার কিনব আমরা পায়জামা। সাধারণত কয়েক ধরনের পায়জামা পাওয়া যায় আমাদের দেশে। চুড়িদার পায়জামা, ধুতি পায়জামা, কাবলি পায়জামা, সাধারণ পায়জামা। আমাদের কিনতে হবে সাধারণ পায়জামা। আমরা যার জন্য এ পায়জামা কিনব, তার এ ধরনের পায়জামা পরারই নিয়ম। নিচের দিকে ঢোলা, সুতি, সাদা পায়জামা।

পাঞ্জাবি কিনলাম আমরা, স্যান্ডো গেঞ্জি কিনলাম, পায়জামাও। এগুলোর সঙ্গে মানানসই একটা জুতা কেনা দরকার এখন। তবে যেই-সেই জুতা কিনলে হবে না, পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে যেটা মানায়, যেটা ভালো লাগবে, যেটার ভেতর আভিজাত্যের সাধারণ ছোঁয়া থাকে, সেটা কিনতে হবে। এ ক্ষেত্রে চটি ধরনের স্যান্ডেল হলে ভালো হয়। পায়জামা-পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে চটি স্যান্ডেল—একেবারে ১০০-তে ১০০। বাজারে অনেক ধরনের চটি স্যান্ডেল পাওয়া যায়। যদি ভারতপন্থি হন তাহলে কোলাপুরি, পাকিস্তানপন্থী হলে শিয়ালকোটি স্যান্ডেল। অবশ্য আমাদের দেশের তৈরি অনেক স্যান্ডেলও পাওয়া যায়। যেহেতু আমাদের কোনো নিজস্বতা নেই, আলাদা কোনো পরিচিতি নেই, নেই কোনো মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিগূঢ় দেশপ্রেম; সুতরাং যে কোনো এক ধরনের হলেই চলবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন ভাবগম্ভীরতাসমৃদ্ধ হয়।

আসুন, এবার আমরা একটু বিশ্রাম নিই। যা গরম পড়েছে, কোনো এসিসমৃদ্ধ ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকে এক গ্লাস করে জুস খাই। ফলের মাস, অনেক ফল পাওয়া যায় এখন। যার যা পছন্দ সেই ফলের জুস খেয়ে আর কী কী কেনা যায়, তা নিয়ে একটু ভাবি, আলোচনা করি, প্রয়োজন হলে গোলটেবিল একটা বৈঠকও করতে পারি। ভাবছেন, গোলটেবিলবিষয়ক ঠাট্টা করছি! আরে ভাই, আজকাল কত কিছু নিয়েই তো গোলটেবিল বৈঠক হচ্ছে। তবে আমরা যেজন্য পায়জামা-পাঞ্জাবি, চটি-স্যান্ডেল কিনলাম, তার জন্য এখন গ্লিসারিন কেনা প্রয়োজন। গ্লিসারিন দিয়ে অনেক কাজ হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কান্নার অভিনয় করার সময় চোখে গ্লিসারিন লাগিয়ে দেন, তাতে তাদের কাঁদতে সুবিধা হয়। এমনি এমনি তো আর কান্না আসে না। আমাদেরও এখন গ্লিসারিন কিনতে হবে। যাদের জন্য কিনব তাদেরও সহজে কান্না আসে না, চোখ-মুখ কুঁচকে কান্নার চেষ্টা করেন, তা-ও আসে না। রুমাল মুখে চেপে ধরে ফোঁত ফোঁত করেন, তাও না। সুতরাং সঠিকভাবে কান্না ঝরানোর জন্য গ্লিসারিন অত্যাবশ্যক।

এরপর আমাদের মুখোশ কেনার দরকার হতো। তবে তারা সব সময় মুখোশ পরে থাকেন তো, তাই আপাতত ওটা না কিনলেও চলবে। সত্যিকারের মুখোশ থাকতে ওরকম কৃত্রিম মুখোশের দরকার কী!

আমাদের আরও কিছু কিনতে হবে। এর মধ্যে ফুলের মালা হচ্ছে প্রথম। তবে ফুলের মালা যেহেতু দু'দিনের বেশি টেকানো যায় না, তাই সেটা প্রয়োজনের সময় কিনলেই চলবে। এখনই কিনে স্টক করার কোনো দরকার নেই।

এবার আসল প্রসঙ্গে আসি। আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, কেন এসব কিনলাম? তার আগে আপনাদের ধন্যবাদ দিতে চাই ধৈর্য সহকারে আমাকে এতটুকু সময় দেওয়ার জন্য। কয়েকদিন আগে লঞ্চডুবিতে মারা গেল বেশ কয়েকজন মানুষ। ফিটনেসবিহীন যানবাহন, ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী বহন, মেয়াদোত্তীর্ণ যন্ত্রপাতিকে দায়ী করা হয় এর জন্য। প্রতিবার লঞ্চ ডোবে, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, চটি-স্যান্ডেল পরে কান্না কান্না চেহারা করে আমাদের কর্তাব্যক্তিরা সেখানে পৌঁছে জোরালো বক্তব্য দেন, এটা-ওটা করবেন বলে শরীর গরম করে ফেলেন, প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলে নিজেরা স্বস্তিতে ভোগেন। কিন্তু কাজের কাজ হয় না কিছুই।

কিন্তু তারা কিছু করতে না পারলেও আমরা তো কিছু করতে পারি। তাদের জন্য আমাদের তাই এই পায়জামা-পাঞ্জাবি কেনা। খবরে প্রকাশ, এ বছর আরও বেশ কয়েকটা ঝড় হবে, লঞ্চ ডুববে। আর লঞ্চ ডুবলেই যেহেতু ওনাদের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরতে হয়, তাই আমাদের মাননীয় কর্তাব্যক্তিদের জন্য এই অগ্রিম কেনা। দেশসেবা করতে করতে তাদের এসব কেনার সময় কোথায়! কি, আমরা ভালো কাজ করেছি না! ভালো কাজ যেহেতু করেছি, সুতরাং আসুন আমরা জোরে একটা হাততালি দিই, নিজেরাই নিজেদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিই!

খুব সহজ একটি বিষয়—গণিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই শুধু শুধু এটিকে জটিল করে তুলতে পছন্দ করেন। এ প্রবণতা অতি শিক্ষিতদের মধ্যেই বেশি। যেমন এক দল বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করা হলো, '৪ x ৪ = কত?'

প্রকৌশলী তার প্রাচীন গণনাকারী যন্ত্র স্লাইড রুলকে ঝেড়ে-মুছে কয়েক বার ডানে-বামে টানলেন এবং এক সময় জানালেন, 'উত্তরটি ১৫.৯৯।'

পদার্থবিদ তার টেকনিক্যাল রেফারেন্স বইয়ের পাতা উল্টিয়ে পেছনটা দেখে বললেন, 'এর মান ১৫.৯৮ এবং ১৬.০২-এর মধ্যে অবস্থিত।'

গণিতবিদ কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'আমি ঠিক এ মুহূর্তে জানাতে পারছি না উত্তরটি কত, তবে আমি সবাইকে আশ্বস্ত করছি, এর একটি সুনির্দিষ্ট মান রয়েছে।'

দার্শনিক স্মিত হেসে বললেন, '৪ x ৪ বলতে আসলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

যুক্তিবাদী বললেন, '৪x ৪ ব্যাপারটি আরও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।'

সমাজবিজ্ঞানী বললেন, 'আমি আসলে উত্তরটি জানি না, তবে এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা সমাজের জন্য একটি চমৎকার ব্যাপার হবে, সেটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

মেডিকেলের ছাত্র হঠাৎ বলে উঠলেন, 'গুণফলটির মান মনে হয় ঠিক ১৬।'

সবাই অবাক হয়ে তার কাছে জানতে চায়, এতটা নিশ্চিতভাবে আপনি ব্যাপারটি কীভাবে জানলেন?'

ছাত্রটি উত্তর দিলেন, 'গুণফলটি আমার মুখস্থ ছিল।'

বুঝুন তাহলে, গণিত নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কী কী করেন।

মানব

আরেক দিনের কথা বলি। পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার হলে দুই ক্লোজ বন্ধু কাছাকাছি বসেছে। এক বন্ধু তার অন্য বন্ধুকে তার পরীক্ষার খাতা দেখাতে খুব অনুরোধ করছে; কিন্তু অন্য ছাত্র খাতা দেখাতে ভয় পাচ্ছে। কারণ একে তো এটি অন্যায়, তারপর ধরা পড়লে অন্যায়ের সাহায্যকারী হিসেবে শিক্ষকের কাছে শাস্তি পেতে হতে পারে। এসব ব্যাপারে শিক্ষক খুব কড়া।

সহপাঠী তাকে আশ্বস্ত করে, 'চিন্তা করিস না, স্যার ধরতেই পারবেন না। আমি ধ্রুবক আর চলকগুলো সরাসরি কপি না করে অনেকটা চেঞ্জ করে লিখব। তাহলে আর স্যার ধরতে পারবে না যে এগুলো কপি করা হয়েছে।'

বন্ধুটি খুব আশ্বস্ত না হলেও ছাড়া পাওয়ার জন্য পরীক্ষার খাতা কপি করার জন্য দিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছাত্রটি তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে ঠিকমতো লিখতে পেরেছিস তো?'

হ্যাঁ।' দাঁত বের করে জবাব দল বন্ধুটি, 'তুই যখন একটা ফাংশনকে f লিখেছিস, আমি তাকে g লিখেছি। তুই যখন কোনো চলককে লিখেছিস x, আমি চেঞ্জ করে লিখেছি y। তুই যখন লিখেছিস ষড়ম x+y(1+2), আমি সেটাকে লিখেছি : ABC(3+4)

আসুন, আমরা নিজেরাই দু-একটা প্রশ্ন তৈরি করি, কিন্তু উত্তরটা রেখে দিই সবার জন্য।

ঘোড়া বাবু নামে এক সন্ত্রাসী নারায়ণগঞ্জ এলাকা থেকে প্রতি মাসে নয় লাখ টাকা চাঁদা তুলত। এর একটা ভাগ যায় দিত সে ক্ষমতাসীন দলের কাউকে, একটা ভাগ দিত বিরোধীদলের কাউকে, একটা ভাগ দিত থানার কাউকে, একটা ভাগ দিতে হতো তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের, বাকি টাকাটা নিজের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা অর্থাৎ নিজে বেঁচে থাকার জন্য খরচ করত সে। ধর্ষণজনিত নয়টা কেস ছিল ঘোড়া বাবুর নামে। এগার মার্ডার কেস, তেইশটা ডাকাতি কেস, বারোটা ছিনতাই কেস, সতেরটা জমি দখলের কেস, অন্যান্য আরও একত্রিশটি কেস। এত কেস মাথায় নিয়ে দিব্যি সে ঘুরে বেড়াত এবং মাসে নয় লাখ টাকার মতো চাঁদাবাজি করত, এরপর সবাইকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম যেত, স্বপ্ন দেখত, [সে একটাই স্বপ্ন দেখত—জনপ্রতিনিধি হবে সে, মানুষের সেবায় জীবন বিলিয়ে দেবে], সকালে উঠে বাথরুমে দাঁড়িয়ে ছ্যারছ্যার করে প্রসাব করত। সাধারণ জনগণ ভাবতেন—আরে, ঘোড়া বাবু এত কিছু করেও টিকে থাকে কীভাবে।

না, কোনোভাবেই কোনো কিছু হয় না ঘোড়া বাবুর। যথারীতি সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আর জনপ্রতিনিধি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

একদিন।

কাচপুর ব্রিজের পাশে একদিন ঘোড়া বাবুকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়, উপুড় হয়ে, স্থির হয়ে। শরীরে চাপচাপ রক্ত, মাছি ঘিনঘিন করছে চারপাশে। পরদিন কয়েকটি পত্রিকা লিখল—মানবাধিকার বর্জিত কাজ হয়েছে এটা। কয়েকটা সংগঠনও বিবৃতি দিল, দু-একজন কলামিস্ট এবং বুদ্ধিজীবীও।

এখন আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে–ঘোড়া বাবু যে এতদিন মানবাধিকার বর্জিত কাজ করেছে, তাতে কোনো পত্রিকা, কোনো বুদ্ধিজীবী, কোনো সংগঠন তার কী করতে পেরেছে? কীভাবে সে এতদিন সাধারণ মানুষের ক্ষতি করল?

দুই. ধর্ষণ, ছিনতাই, খুনের মতো কাজ যে লোকটা অবলীলায় করত সেটা বেশি মানবাধিকার বর্জিত, না তাকে মেরে ফেলা বেশি মানবাধিকার বর্জিত?

তিন. ঘোড়া বাবুকে না হয় উপুড় করে ফেলে রাখা গেছে, তার অন্যায়ের ভাগ যারা পেয়েছে, তারা তো দিব্যি এখনও হাসিয়া-খেলিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাদের নিয়ে কিছু কথা না বলা কি আরও মানবাধিকার লঙ্ঘন না?

কে কে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেন? পারলে জায়গায় বসে আওয়াজ দিয়েন। আমরা নিজে গিয়ে উত্তরগুলো জেনে আসব।

বিদ্যুৎ অফিসে মিটার রিডারের কাজ করেন জামালউদ্দিন পাটোয়ারী। একদিন সন্ধ্যায় অফিসে খাটাখাটনি করে বাড়িতে ফিরে দেখেন তার স্ত্রী সোফায় বসে টিভি দেখছে। বউয়ের এ বিনোদনপ্রবণতা দেখে ভদ্রলোকের মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। তিনি প্রভুর কাছে মনে মনে বললেন, 'হে প্রভু, আমি সারাদিন অফিসে খেটে মরি আর আমার বউ বাসায় বসে বসে মজা করে। এটা তো সহ্য করা যায় না। তুমি এক কাজ করো। মাত্র একদিনের জন্য আমাকে মহিলা আর ওকে পুরুষ বানিয়ে দাও। তাতে ও যেমন বুঝতে পারবে আমি সারাদিন কতটা কষ্ট করি। এর ফলে আমিও একটা দিন বাড়িতে বিশ্রাম করতে পারব।'

পরদিন সকালে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। পাটোয়ারী সাহেব ঘুম থেকে উঠে খেয়াল করে দেখলেন, তিনি আর পুরুষ নেই, মহিলা হয়ে গেছেন। ওদিকে পাশে তার স্ত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে দেখেন তিনিও মহিলা নেই, পুরুষ হয়ে গেছেন। ব্যাপারটা দেখে খুশি হয়ে গেলেন পাটোয়ারী সাহেব। তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, প্রভু তার মনের আশা পূরণ করেছেন।

অগত্যা সদ্য মহিলা বনে যাওয়া পাটোয়ারী সাহেব স্যরি, মিসেস পাটোয়ারী বিছানা থেকে উঠে স্বামীর (!) জন্য নাস্তা তৈরি করলেন। ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে উঠালেন, ধরে ধরে নাস্তা করালেন তাদের। স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে দিলেন। ড্রেস পরিয়ে দিলেন স্কুলের। টিফিনগুলো ব্যাগে দিয়ে দিলেন যার যার বক্সে ভরে। তাদের স্কুলে দিয়ে এলেন। তারপর বাড়ি ফিরে নোংরা কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে খেয়াল করলেন ডিটারজেন্ট নেই। অগত্যা দোকানে গিয়ে সেরে ফেললেন দিনের বাজারটা। বাড়ি ফিরে কাপড়গুলো আবার ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে রান্নার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন দুপুরের। এটা-সেটা কাটাকুটি শেষে সবকিছু

যারা ভাবেন, মেয়েরা কোনো কাজ করেন না!

চুলায় বসিয়ে খেয়াল করলেন আজ গ্যাস বিল দেওয়ার লাস্ট ডেট। বিল না দিলে কাল গ্যাসলাইন কেটে দিয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে বিল নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা পর বিল দিলেন। ততক্ষণে বাচ্চাদের স্কুল ছুটির সময় হয়ে গিয়েছিল। মিসেস পাটোয়ারী বিল দেওয়া শেষে বাচ্চাদের স্কুল থেকে নিয়ে এলেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তখনও রান্না হয়নি। তাই বাইরে গিয়ে খাবার কিনে বাচ্চাদের দুপুরের খাবার খাওয়ালেন। এদিকে ঘড়ির কাঁটার তখন দুপুর ১টা।

ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মিসেস পাটোয়ারী সেগুলেকে বের করে আয়রন করতে বসলেন। তারপর পুরো ঘর ঝাড়ু দিয়ে সেটাকে মুছতে মুছতে বলতে গেলে হাঁপিয়ে উঠলেন। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। কারণ এখনও অনেক কাজ বাকি। বাড়ির পোষা কুকুরটাকে খাইয়ে বাচ্চাদের নিয়ে বসলেন তাদের হোমওয়ার্ক করে দেওয়ার জন্য। তাদের সঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে মিসেস পাটোয়ারীর গলাই বসে গেল। বাসায় কোনো খাবার তখনও তৈরি হয়নি। তাই দেরি না করে রাতের খাবার বানানোর দিকে মনোযোগ দিলেন। ভাত, সঙ্গে তিন পদের তরকারি রান্না করতে গিয়ে সন্ধ্যা ৭টা বেজে গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে কোমরটা ধরে এসেছিল বলে সোফায় বসে টিভিটা খুলে সন্ধ্যার খবর দেখছিলেন, আর ঠিক তখনই স্বামী মহোদয় অফিস থেকে ফিরে এলেন।

এদিকে তখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে ছিল। এলোমেলো রান্নাঘরটা গোছালেন। রাতের খাবারের পর এঁটো বাসনপত্র পরিষ্কার করলেন। ময়লার ঝুড়িটা সিটি করপোরেশনে ডাস্টবিনে ফেলে এলেন। সব শেষে ক্লান্ত শরীরে যখন বিছানায় ঘুমুতে এলেন তখন স্বামী প্রবর তার স্ত্রীকে কিছুটা সময় একান্তে পেতে চাইলেন। সারা দিনের ক্লান্তির পরও মিসেস পাটোয়ারীর পক্ষে স্বামীকে তার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলো না। তবু মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন এটা বলে যে, একদিনের ব্যাপার। একটু সহ্য করে নেই। কাল আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাটোয়ারী সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন। খেয়াল করে দেখলেন, তিনি এখনও মহিলাই রয়ে গেছেন! পুরুষে ফিরে যাননি। তিনি অবাক হয়ে প্রভুর কাছে মিনতি করতে বসলেন, 'হে প্রভু আমি একদিনের জন্য মহিলা হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একদিন পার হওয়ার পরও দেখছি আমি পুরুষ হইনি। তুমি জলদি আমাকে পুরুষ বানিয়ে দাও। আমার পক্ষে এত পরিশ্রম করা সম্ভব হচ্ছে না।'

একটু পর ওপর থেকে গায়েবি আওয়াজ এলো, 'হে পাটোয়ারী, আমি তোমাকে একদিনের জন্যই মহিলা বানিয়েছিলাম। কিন্তু কী করব বলো, গত রাতে তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ। তাই পুরুষ হওয়ার জন্য তোমাকে অন্তত ১০ মাস অপেক্ষা করতেই হবে!'

একটা আষাঢ়ে গল্প বলব তোমাকে

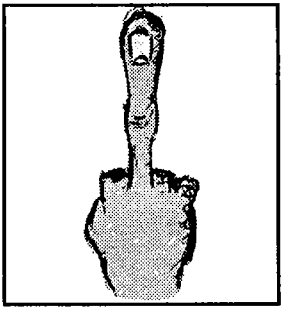

বৃষ্টি হচ্ছে বেশ নিয়মিতই। থেমে যায় মাঝে মধ্যে। তবে বর্ষার মেঘ খেলা করে আকাশে, প্রায়দিনই—বর্ণিল, নববধূ রঙে, রহস্যে। কদম ফুল তেমন ফোটেনি, পোয়াতি হয়েছে শহরের সবগুলো গাছ, অপেক্ষায় আছে সমর্পণের বিহ্বলতা নিয়ে। কিন্তু আষাঢ় এসেছে। তুমি জানো—আষাঢ় বাংলা বর্ষপঞ্জির কততম মাস? অবাক হচ্ছো? আমি কিন্তু অবাক হওয়ার মতো কথা বলিনি। অনেকেই বলতে পারবে না। তা না পারুক। আষাঢ় এসেছে, সবুজ হয়েছে পৃথিবীর সব পাতা, মরা গাঙ ভরে উঠেছে নতুন পানির যৌবনে। আজ আষাঢ়ে গল্প শোনাব তোমাকে।

রূপনগর থেকে পল্লবীর প্রধান সড়কে প্রতিদিন প্রায় এক লাখ মানুষ চলাচল করে। নয় সালেও রিকশা ভাড়া ছিল মাত্র ৫ টাকা, দশ সালে ১০ টাকা, গ্যাসের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক'দিন থেকে অলৌকিকভাবে সেই ভাড়া দাঁড়িয়েছে ১৫ টাকা। কঠিন কথা —রিকশাওয়ালা তবুও যেতে চান না। কারণ পুরো রাস্তার অর্ধেকটা এ পরিমাণ নষ্ট হয়ে গেছে, বৃষ্টি হলে সেখানে সাময়িক মাছ চাষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, পাশে রাখা ডাস্টবিনের আবর্জনার গন্ধে বেরিয়ে আসতে চায় পেটের সবকিছু। কিন্তু আষাঢ়ে গল্পটা কি জানো? কেউ কিছু বলছে না এ ব্যাপারে, সবাই অনুগত ভৃত্যের মতো মাথা নিচু করে পথ চলছে। খেয়াল করছে না রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি। প্রতিনিয়ত আমরা ছোট থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছি।

হরতালের মৌসুম শুরু হয়ে গেছে, পুরো দমে। গাড়ি পোড়ানো হচ্ছে, গাড়ি ভাঙা হচ্ছে, হয়রানি করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, রাস্তাঘাটে মানুষজন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। কিন্তু তুমি কি বলতে পারবে—কার স্বার্থে এই হরতাল? হরতাল করে কে বা কারা সুবিধা ভোগ করবে? তুমি এটা জানো, আমিও।

কিন্তু কিছুই বলতে পারি না। হালটানা গরুর মতো জীবন বাহিত হয়ে যায় আমাদের। আজ যে ক্ষমতায় সে হরতালবিরোধী, বিরোধী দলে গিয়ে সে হরতাল-আনন্দে মেতে উঠবে; আজ যে ক্ষমতাহীন হরতাল-উৎসবে ব্যস্ত সে, কাল ক্ষমতায় গেলেই হয়ে যাবে হরতালবিরোধী। আপন স্বার্থে সবাই ব্যস্ত, বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই কারও জন্য—না দেশের জন্য, না মানুষের জন্য। আষাঢ়ে গল্পটা হচ্ছে, এই তাদেরই ভোট দিতে হবে, তাদেরই ক্ষমতায় বসানোর জন্য রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে লাইনে দাঁড়াতে হবে আমাদের!

সবকিছুর হঠাৎ দাম বেড়ে গেছে। চালের দাম বেড়েছে, ডিমের দাম বেড়েছে, সবজির দাম বেড়েছে। মাছের দাম বেড়েছে, মাংসের দাম বেড়েছে, দুধের দাম বেড়েছে। বাস ভাড়া বেড়েছে, রিকশা ভাড়া বেড়েছে, লঞ্চ ভাড়া বেড়েছে। চারদিকে কেবল বেড়ে যাওয়া আর বেড়ে যাওয়া। ঘর ভাড়া বেড়েছে, ঘরের জিনিসের দাম বেড়েছে, ঘর থেকে বের হওয়ার পর যেদিকে চোখ যায়, সবকিছু বেড়েছে। আষাঢ়ে গল্পটা হলো—কেবল মানুষের দাম বাড়েনি, বরং কমেছে। মিরপুরের পল্লবী সিনেমা হলের সামনে প্রতিদিন সকালে কয়েকশ' মানুষ বসে থাকে ঘর রঙ করার জন্য, মাটি কেটে দেওয়ার জন্য, ইট ভেঙে দেওয়ার জন্য—হরেকরকম কাজ করে দেওয়ার জন্য। কোনো কোনো দিন অনেকে বসেই থাকেন, সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে যায়, করুণ হয়ে আসে তাদের চোখ, ঠোঁট, মুখ, চেহারা। আরও একদিন আধবেলা খেয়ে বেঁচে থাকার মহড়া! কী নিদারুণ, কী মর্মান্তিক। এত কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে, মানুষ বেঁচে থাকার পথ হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু কোনো রাজনীতিবিদকে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখেছ তুমি, অস্থির হতে দেখেছ তুমি? চোখের নিচে ভাঁজ দেখেছ কারও, কিংবা সামান্য কালচেটে দাগ? হায়, এরাই নাকি জনগণের সেবক, দেশ সেবক!

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে হুলস্থুল বেধে গেছে। একদল রাখতে চাচ্ছে, আরেকদল রাখতে চাচ্ছে না। তত্ত্বাধায়ক সরকারের কাজটা কী? নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা? তারপর? তারপর যে দল ক্ষমতায় আসে তারা কতটুকু তত্ত্বাবধান করে আমাদের, সাধারণ জনগণের ? এই যে প্রতিদিন এত মানুষ খুন হচ্ছে, এত অন্যায় হচ্ছে, এত অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে, কবে শেষ হবে এসবের? কবে আমরা একটু হলেও সুস্থির হবো, কবে একটু হলেও নিজেকে নিরাপদ ভাবব। তোমাকে বরং আসল আষাঢ়ে গল্পটা বলি এখন। এই যে এত কিছু, এত প্রতিবন্ধকতা, এই যে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তা, তারপরও আমরা এখনও ফুল ফোটাই, শস্য ফলাই, নদীর পানির ঢেউ দেখি, বটবৃক্ষের ছায়া অনুধাবন করি। আমরা এখনও অন্য মানুষের দুঃখে দুঃখিত হই, অন্যের কষ্টে কষ্টমুখরতায় কাটাই, অন্যের আনন্দে আনন্দিত হই অবলীলায়। আমরা এখনও বেঁচে আছি, বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকার অভিনয় করি।

সূচনা : সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে নিজেকে দাবি করে যে জীবটি অবলীলায় যার নিজ গোত্রের জীবকে হত্যা করে, যন্ত্রণায় রাখে, পণ্য করে, যখন তখন ঝামেলায় ফেলে, সেই জীবটি হচ্ছে মানুষ। যারা নিজেকের আবার বিবেকবান, মানবিক, মনুষ্যত্বময় বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে সব সময়!

আকৃতি : মানুষের দুটি হাত আছে। এই হাত দিয়ে একেকজন একেক কাজ করে। অফিস আদালতে ঘুষের টাকা নেয়, অন্ধকার গলিতে ছিনতাই করার জন্য ছুরি রাখে, ভারী অস্ত্র চেপে ধরে মানুষকে মেরে ফেলার জন্য, কলম হাতে যা তা লিখে নিজেকে হলুদ সাংবাদিকে পরিণত করে, শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া নিষিদ্ধ জেনেও অনেক শিক্ষক হাতে বেত নিয়ে ছাত্রদের পেটাতে থাকে, পবিত্র সংসদে অনেকে ফাইল চাপড়ায়, তৈলাক্ত ভাষণে অনেক হাত তালি দেয়, অনেকে গালে হাত রেখে দার্শনিকের মতো ভাবতেও থাকে।

দুই হাতে আবার দশটা আঙুল থাকে। অনেকের দু-একটা বেশিও থাকে। যেমন ভারতের ফিল্মস্টার ঋত্বিক রোশনের এগারটা আঙুল। এই আঙুল আবার বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট চেপে ধরে অনেকে ধূমপান করে, অনেকে পাষণ্ড স্বামী সাঈদের মতো চোখ নষ্ট করে দেয়, অনেকে আবার আঙুলের কারসাজিতে সমাজের অনেক কিছু ঘটিয়ে ফেলে।

একটি রচনা লিখ
~~গরু~~ মানুষ

এই হাত বা এই আঙুল দিয়ে আবার মানুষ সবুজ বৃক্ষ বোনে, যে বৃক্ষ আমাদের ছায়া দেয়; বিভিন্ন ফুলগাছ রোপণ করে, যে ফুল আমাদের মোহিত করে; প্রযুক্তি খাটিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করে, যা মানুষের কল্যাণে আসে।

দুটি পা আছে মানুষের। পা দিয়ে মানুষ অনেক কিছু করে। হাঁটে, লাফায়, দৌড়ায়। দৌড় আবার অনেক রকমের আছে। খেলোয়াড়দের দৌড়, মানুষের দাবড়ানি

খাওয়ার দৌড়। যেমন কয়েক বছর আগে ডেমরার সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন সাহেব মানুষের দাবড়ানি খেয়ে দৌড় দিয়েছিলেন।

মানুষের দুটি চোখ আছে, যা দিয়ে সে দেখে। মানুষের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে মানুষ নিজের চোখ দিয়ে সরাসরি নিজের চেহারা দেখতে পায় না। তবে সে অন্যের জমি দেখতে পায়, অন্যের জায়গা দেখতে পায়, সম্পদ দেখতে পায়, বাড়িঘর, দালানকোঠা সব দেখতে পায়। ফলে সে অন্যের সব কিছুর ওপর লোভী হয়ে ওঠে, ওসব নিজের করে পেতে মন চায়, ফলে ওসব দখল করতে ইচ্ছা করে তার। চোখ দিয়ে মানুষ ভয়ও দেখায়, আবার ভালোবাসাও প্রকাশ করে। চোখ হচ্ছে এমন একটা অঙ্গ, যা দিয়ে মনের কথা বলা যায়। ওই যে গান আছে না—চোখ যে মনের কথা বলে! তবে হরেকরকম চোখ আছে মানুষের। ট্যারা চোখ, পটলচেরা চোখ, গরু চোখ, বিলাই চোখ।

কান হচ্ছে আর নাক হচ্ছে এমন দুটি অঙ্গ যার উদ্বৃত্ত অংশটুকু না থাকলেও সম্ভবত চলত। শুধু ফুটোগুলো থাকলেই হতো। কিন্তু উদ্বৃত্ত অংশ না থাকলে অসুবিধা হতো। পড়া না পারলে স্যাররা ছাত্রদের কান ধরতেন কীভাবে, দুল পরত কোথায় মানুষ, মাইক টাইসন হলি ফিল্ডের কামড় দিতেন কোথায়? নাক কিংবা নাকের মাংস কখনও গলানো যায় না, তবু 'নাক গলানো' নামে একটা শব্দ আছে। এই নাক গলানো মানে হচ্ছে নিজের কাজ বাদ দিয়ে অন্যের কাজে মনোযোগী হওয়া। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো। যেমন অনেকে নিজে ঠিকমতো ট্যাক্স না দিলেও জনগণকে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

মানুষের একটা মুখ আছে। সেখান দিয়ে সে যতটুকু সময় না খাবার গ্রহণ করে তার চেয়ে বেশি সেখান দিয়ে শব্দ বের করে। রাজনীতিবিদ, ফুটপাতের হকার, রেডিওর আরজেরা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। চাপাবাজি, মিথ্যাবলা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সেটা না রক্ষা করা সবাই এই মুখকেন্দ্রিক। অনেকে বলেন, এই মুখের জন্যই নাকি দুনিয়ার সব কিছু। এই মুখ না থাকলে খাবার খাওয়া লাগত না, খাবার খাওয়া না লাগলে কোনো কাজ করা লাগত না, কাজ না করলে কোনো কিছু আবিষ্কার হতো না—টিভি আবিষ্কার হতো না, মোবাইল আবিষ্কার হতো না, কাপড়চোপড় কিছুই আবিষ্কার হতো না। হায় হায়, কাপড় আবিষ্কার না হলে মানুষ পরত কী? মানুষের গায়ের চামড়া কোনো কাজে না লাগলেও এই চামড়ার অনেক ভূমিকা আছে। অনেকের চামড়া গণ্ডারের মতো অনুভূতিহীন বলে পাঁচ বছর পরপর আমাদের দ্বারে আসে হাত চিৎ করে। ভুলে যায় আগের কথা, ভুলে যায় আগের সব প্রতিশ্রুতি, নির্লজ্জের হাসি হেসে দাঁড়িয়ে থাকে বোকা চাহনিতে।

উপকারিতা : মানুষ বড় উপকারী জীব। খাবার যেন সহজে পচে না যায় তার জন্য ফরমালিন আবিষ্কার করেছে। লেগুনের মতো পচা পানিতেও মাছ চাষ করে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে তারা।

অপকারিতা : একজন মানুষ একদিনে যতটুকু খাবার খেতে পারে তার চেয়ে বেশি খাবার অনেকের টেবিলে থাকে, বাসায় থাকে, ফ্রিজে থাকে। ফলে অনেককেই না খেয়ে থাকতে হয়। আবার অনেকে বেশি খেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

উপসংহার : মানুষ বোম আবিষ্কার করেছে, অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, মিসাইল আবিষ্কার করেছে। অন্য কাউকে মারার জন্য নয়, নিজ গোত্রকে মারার জন্যই। সেই মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে বলে লজ্জায় সারা পৃথিবীর বরফ গলে যাচ্ছে, ভূমিকম্পের নামে পৃথিবী ফুসে উঠছে, পাহাড় ভেঙে পড়ছে অবলীলায়!

অ-তে অজগর ওই আসছে তেড়ে, আ-তে আমটি আমি খাব পেড়ে। শিশুতোষ বইয়ের বর্ণপরিচয়ের প্রথম লাইন এটা। অতীব দুঃখের বিষয়, এই সময়ে, এই ক্ষণে লাইনটি পুরোপুরি মিথ্যা। এখন আর দেশে তেমন অজগর নেই, আরও একটা বিষয় হচ্ছে, অজগর কখনও তেড়ে আসে না। ভারী ও বৃহৎ এ প্রাণীটি আসে ধীরে এবং নীরবে। আর আমের ব্যাপারটা হচ্ছে, এখন আর আমগাছ কোথায়? নাগরিক পদচারণ আর কংক্রিট দালানের দাপটে গাছ সব উজাড়। গাছ যেহেতু নেই, আমও নেই। আর আম না থাকলে পেড়ে খাওয়ার প্রশ্নই তো আসে না। কিছু আমের বাগান আছে উত্তরাঞ্চলে, সেই এলাকার মানুষ আম পেড়ে খায় না। পাকার আগেই ঝাঁকা ভরে বিক্রি করে দেয় পাইকারদের কাছে। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস—শিক্ষার প্রথম প্রহরেই কোনো শিশুকে এই মিথ্যা কথাটি শিখতে হয়। যাদের মিথ্যা দিয়ে জীবন শুরু, তাদের জীবনটা কি ভালো কাটে, না কেটেছে কখনও?

কিন্তু পেড়ে খেতে না পারলেও আম তো খেতে হবে আমাদের। আমাদের শহরের বাসিন্দারা আমের দিনে আম খেতে পারবে না, তা কি কখনও হয়?

আমাদের আম খাওয়ানোর জন্য রাজশাহী গিয়েছিলেন মোশাররফ। বেছে বেছে আম কিনলেন, ট্রাক ভাড়া করলেন, ঢাকার দিকে আসতে লাগলেন। নাটোরের কাছাকাছি আসতেই তিনি দেখলেন, বেশ কয়েকটা গাছ পড়ে আছে রাস্তায়। ড্রাইভার ব্রেক করলেন ট্রাকের।

এরপর?

লাঠি হাতে কয়েকটি ছেলে দৌড়ে এলো ট্রাকের কাছে। কয়েকজনের হাতে বোতল। ট্রাকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল কয়েকটা ছেলে, কেউ লাঠি দিয়ে বাড়ি দিতে লাগল, কেউ একজন একটা বোতল ছুঁড়ে মারল ট্রাকে। আগুন লেগে গেল ট্রাকে মুহূর্তেই।

আমাদের জন্য আম আনতে গিয়ে

সারা ট্রাকে আগুন, আর আগুনের ভেতর মোশাররফ। বের হতে পারছেন না তিনি কোনোভাবেই। আগুন বাড়ছে; দাউ দাউ করে বাড়ছে।

মাথার চুলে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে মোশাররফের মনে পড়ল তার বাবার কথা। বাবা প্রায়ই মাথায় হাত বোলাতেন আর বলতেন, 'জীবনটা কষ্টের রে বাপ। প্রতিদিন এই মাথায় নতুন নতুন কষ্ট আসবে, সেই কষ্টকে পাশ কাটিয়ে নতুনভাবে বাঁচতে হবে।' মরে যাওয়ার মতো তাপে মোশাররফ ভাবলেন—না, এই মাথায় যত কষ্টই আসুক, তাকে বাঁচতে হবে।

বুকের বাঁ পাশটায় আগুন লাগার পর সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে তার। মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। ছোটকালে একটা পোকা কামড় দিয়েছিল তার বুকে, বাঁ বুকে। ফুলে লাল হয়ে গিয়েছিল, ব্যথাও করছিল। সারারাত বসে মা সেখানে কী একটা তেল মালিশ করেছিলেন, আর কাঁদছিলেন। মায়ের পরশটা অনুভব করতে করতে ডান পাশটায় আগুন লেগে যায় তার। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেন তিনি সেখানে।

ডান হাতের আঙুলে আগুন লেগে গেলে মোশাররফ অবাক চোখে সেই আগুনের দিকে তাকান। তার চামড়া পুড়ছে, আর তিনি তাকিয়ে আছেন। একটু পর তিনি টের পান বাঁ হাতের আঙুলেও আগুন লেগেছে তার। দু'হাত চোখের সামনে এনে তিনি বোধ হারিয়ে ফেলেন।

পেটে আগুন লেগে যায় এবার মোশাররফের। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারেন—পেটের ভেতরের আগুন আর পেটের বাইরের আগুনের জ্বালা প্রায় একই। দুটো আগুনই চারপাশ অন্ধকার করে ফেলে, বিবেক-বোধ-জ্ঞান লোপ পাইয়ে দেয়, সবকিছু শূন্য করে দেয় নিমিষে।

কোমারের নিচ থেকে আগুন জ্বলতে থাকে এবার মোশাররফের। আস্তে আস্তে পা পর্যন্ত পুড়ে যায় তার। এরপর বহু চেষ্টায় বের হয়ে আসেন তিনি আগুনে জ্বলা ট্রাক থেকে। ততক্ষণে পুড়ে গেছে তার শরীরের প্রায় নব্বই ভাগ!

টাকি মাছের সালুন রান্না করছেন মোশাররফের মা। ছেলে তার টাকি মাছের সালুন পছন্দ করে। হরতালের দিন ছেলেকে দূর শহরে পাঠাতে বুকটা কেঁপে উঠেছিল তার। কিন্তু শেষমেশ পাঠাতেই হয়েছে। সংসারের আয় বলতে তো ওই ফল বিক্রি করাটাই। ফল না বেচলে পেট চলবে কীভাবে, জীবন বাঁচবে কীভাবে!

বুকের ভেতর কেমন যেন পুড়ছে তার। ছেলেটা ভালো আছে তো? ভাবতে ভাবতেই তিনি হঠাৎ দেখেন, চুলোর আগুন বেশি জ্বলে উঠছে, পুড়ে যাচ্ছে টাকি

মাছের তরকারি। দ্রুত তিনি কমিয়ে ফেলেন আগুনের আঁচ কিন্তু এর পর থেকে বাম চোখের পাতাটা কেমন যেন কাঁপতে থাকে তার।

ছেলের বিপদে মায়ের চোখের পাতা কাঁপে। ছেলে যে অতি আপনজন! আমাদের এই দেশটাকেও অনেকে আপন ভাবেন, নিজেকে মায়ের মতো মনে করে গলা ফুলিয়ে ভাষণ দেন। এই যে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কি কখনও চোখের পাতা কেঁপে ওঠে? বুকের ভেতরটা একটিবারের জন্যও মোচড় দিয়ে ওঠে?

যদি কেউ বলেন কাঁপে, মোচড় দিয়ে ওঠে; আল্লার কসম, ওই নির্লজ্জ মিথ্যা কথাটা বলার জন্য তার জিভটা কেটে ফেলব আমি।

খসরু আমাকে একদিন গোল ধরনের একটা ফল এনে বলল, 'এটা খাবি?' ও আমার বন্ধু। আমার দিকে ফলটা এগিয়ে দিল ও, 'খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে। খুব মিষ্টি।'

ক্লাস থ্রিতে পড়ি আমি তখন। ওরকম ফল কখনও দেখিনি আগে। হাতে নিয়ে বললাম, 'কী নাম এটার?'

'আগে খেয়ে দেখ, তারপর বলছি।'

হাতের চাপে ফলটা ভাঙলাম আমি। কয়েকটা কোয়া বের হলো ওটার ভেতর থেকে, শক্ত কোয়া। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে একটা কোয়া মুখে দিলাম। বেশ মিষ্টি, অন্যরকম স্বাদও। কোয়াগুলো খাওয়া যায় না, চুষে ফেলে দিতে হয়। সবগুলো চুষে ফেলে দেওয়ার পর আমি আবার ওকে ফলটার নাম জিজ্ঞেস করলাম। খসরু হাসতে হাসতে বলল, 'গাব।'

গাব চেনানো খসরু এখন একটা আটার মিলের মালিক। ওর ওই মিলে গম ভাঙানো হয়, ধান ভাঙানো হয়। পাশে ছোট্ট একটা মেশিনে শুকনো মরিচ, হলুদ ধনিয়াও ভাঙানো হয়। ওকে দেখলে মনে হয় নুয়ে পড়েছে ও—বয়সে, মননে, বেঁচে থাকার ক্লান্তিতে!

মাটির বন্ধু

বুলবুলি পাখির ডিম যে ফোঁটা ফোঁটা রঙের হয়, নূরুল আমাকে সেটা চিনিয়েছিল। ঝড়ের রাতে পড়ে থাকা একটা শালিক পাখির বাচ্চা এনে আমাকে দিয়ে ও একদিন বলেছিল, 'এটা বড় হলে ময়না পাখির মতো কথা বলবে।' পাখির কথা শোনার লোভে বাচ্চাটা বড় করছিলাম আমি। কিন্তু একটা দুষ্টু বিড়াল সেটা আর করতে দেয়নি। আরও কী একটা যেন পাখির বাচ্চা ও এনে দিয়েছিল। একদিন সকালে উঠে দেখি, পিঁপড়ের দলে ঢেকে আছে সেটা।

নূরুল এখন রিকশা চালায়। প্যাডেলের চাপে চেপে আছে ওর জীবন। কালো মানুষটা রোদ-বৃষ্টিতে আরও কালো হয়ে গেছে। জীবনের সব রঙ এখন সে কালোই দেখে!

আনোয়ার কখনও স্যান্ডেল পরে স্কুলে আসত না। স্যান্ডেল ওর নেই, না স্যান্ডেল পরতে ও পছন্দ করে না; সেটা কখনও জানা হয়নি আমার। কখনও স্থির থাকতে দেখিনি ওকে। হাঁটতেও দেখিনি। সারাক্ষণ দৌড়াত। এ ক্লাস থেকে ও ক্লাস, এ মাঠ থেকে ও মাঠ, যেন আল্লাহ ওর পা দিয়েছেন দৌড়ানোর জন্য, হাঁটার জন্য নয়। একদিন ওদের বরই গাছ থেকে পাঁচটা মস্ত বড় বরই এনে দিয়েছিল ও আমাকে।

কাঁধে ঝাঁকা নিয়ে আনোয়ার এখন তেল বিক্রি করে, সরিষার তেল। সরিষা ভাঙানোর আদি একটা মেশিন আছে ওদের। গরু দ্বারা সেটা ঘুরিয়ে সরিষা ভাঙানো হয়। যে আনোয়ার কখনও হাঁটত না, দৌড়াত; সে এখনও দৌড়ায়। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে, ঝাঁকা কাঁধে তেল বিক্রি করে—সইসস্যার ত্যাল নেবেন, সইসস্যর ত্যাল!

আশরাফটা একটু অন্যরকম ছিল, চুপচাপ। ক্লাসে এসে সবচেয়ে পেছনের বেঞ্চিতে বসত ও। কথা বলতও কম। কোনো কোনো দিন স্কুলেও আসত না। জিজ্ঞেস করলে বলত, 'ভালোলাগে না, মরে যেতে ইচ্ছে করে।' খুব খারাপ লাগত তখন।

ওদের বাসায় গিয়েছিলাম একদিন। আমাকে তিলের মোয়া খেতে দিয়েছিলেন ওর মা। তারপর চকচকে একটা কাঁসার গ্লাসে পানি। এর আগে আমি কখনও কাঁসার গ্লাসে পানি খাইনি। কী ঠাণ্ডা গ্লাস! পানিও কী ঠাণ্ডা ছিল! কিন্তু একটা কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার—আশরাফের বাবা বহুদিন আগে হারিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। বেঁচে আছেন কি না, তাও না।

বাসের হেলপার এখন আশরাফ। সিরাজগঞ্জ টু কাজীপুরগামী বাসের পেট থাপড়াতে থাপড়াতে ওর এখন প্রতিদিনের সময়। যে আশরাফ আগে চুপচাপ থাকত, সেই আশরাফ এখন সারাক্ষণ চিৎকার করে বেড়ায়—কাজ্জীপুর, কাজ্জীপুর, সিট খালি সিট খালি...।

বিলকিছটা যে কী রকমভাবে হাসতে পারত! আহারে! আট-নয় বছরের সেই বালক আমরা, কেবল ওর ওই হাসি দেখার জন্য কত রকম যে গল্প করতাম ওর সঙ্গে। ও কথা বলত তিন সেকেন্ড, হাসত নয় সেকেন্ড। মাঝে মধ্যে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত মাটিতে। মানুষের হাত-পা-চোখ-ঠোঁট-চুল যে একসঙ্গে হাসতে পারে, সেটা বিলকিছের কাছে দেখেছিলাম।

সেই বিলকিছ একদিন বিয়ে করল, পান খাওয়া শুরু করল। মুখ বোঝাই পান। তারপর পেটে একদিন একটা ভ্রূণেরও ঠাঁই দিল। কিন্তু বাচ্চাটাকে পৃথিবীতে আনতে গিয়েই মারা গেল ও। আমরা তখন দশম শ্রেণীতে পড়ি। আমরা সেদিন অঝোর ধারায় কেঁদেছিলাম। এত হাসিতে হাসিয়েছে ও আমাদের, এত আনন্দ

দিয়েছে আমাদের, সেই ঋণ শোধ করতেই হয়তো কাঁদিয়ে গেল আমাদের। কী নিষ্ঠুর ওর ওই চলে যাওয়া, কী অবিশ্বাস্য ওর ওই প্রস্থান!

খুব লজ্জা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে—এরকম বাসের হেলপার, রিকশাচালক, ফেরিওয়ালা তেল বিক্রেতা বন্ধুর পরিচয় পেয়ে কি একটু চমকে গেলেন! বিশ্বাস করুন, ওদের জন্যে আমি গর্ব বোধ করি, মাথা উঁচু করে রাস্তায় হাঁটি, শুদ্ধ স্বপ্নে জাল বুনি—কারণ ওরা দেশের কোনো টাকা পাচারকারী নয়, সাধারণ মানুষের টাকা লুণ্ঠন করা শেয়ার ব্যবসায়ী নয়, মানবতার ক্ষতিকারক কোনো মুখোশপরা মানুষও নয় ওরা। ওরা মানুষ, পবিত্র বৃষ্টিজলে ধোওয়া ওদের মনুষ্যত্ব, সোঁদা মাটিতে গড়া ওদের হৃদয়, সবুজ ঘাসের সুতোয় বোনা ওদের মন, শুদ্ধ বাতাসের নির্যাসে ভেজা ওদের চোখের কোটর।

ওরা আমার মাটির বন্ধু!

ব্যাপারটাকে কাদের সিদ্দিকী যতই ঠাট্টা মনে করুক, আমরা কিন্তু সেটাকে মোটেই ঠাট্টা মনে করছি না। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সবাইকে কম খেতে বলেছেন, এ উক্তির মধ্যে ঠাট্টা এলো কোত্থেকে! তিনি যে কত বড় একটা কথা বলেছেন সেটা অনুধাবন করার ক্ষমতা আমাদের ক'জনের আছে! এখন তো সত্যি সত্যি কম খাওয়ার সময় এসেছে। বত্রিশ পার্সেন্ট মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, এদের মধ্যে শিশুরাও আছে। ডায়াবেটিস রোগীদের খেতে হয় কম। সকালে তিনটা পাতলা রুটি, সবজি, কুসুম ছাড়া একটা ডিম, টক জাতীয় ফল একটি; এগারটায় মুড়ি বা বিস্কুট, সঙ্গে টক জাতীয় আরও একটা ফল; দুপুরে আড়াই কাপ ভাত, মাছ বা মাংস ২ টুকরা, ডাল ২ কাপ, সবজি; বিকেলে দুধ ১ কাপ; রাতে ৩ টা পাতলা রুটি, মাছ বা মাংস ১ টুকরা, ডাল ২ কাপ, সবজি। এগুলো কোনো খাবার হলো! নতুন ডায়াবেটিস আক্রান্ত এক ভদ্রলোককে এ খাবারগুলো খেতে বলায় তিনি ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি যে আগে খাবারগুলো খেতাম তার খাওয়ার আগে খাব এগুলো, না পরে খাব?'

দেশের ঘরে ঘরে এখন হার্টের রোগী। অন্যান্য রোগে তাও কয়েকদিন বেঁচে থাকার পর মানুষ মারা যায়, এ রোগে মারা যায় হঠাৎ করে, টুপ করে। হার্টের রোগীদের খেতে হয় কম এবং খুব বেছে বেছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, ডিমের কুসুম, বাটার, নেহারি, মোরগ পোলাও, তেহারি—সব রকমের মজার মজার খাবার তার জন্য নিষিদ্ধ। তার মানে কী, হার্টের রোগীরা খাওয়া-দাওয়া করেন খুবই কম।

কোলেস্টেরলের রোগীর সংখ্যা দেশে কম নয়। তাদেরও খেতে হয় হার্টের রোগীর মতো। সব মিলিয়ে দেশের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ রোগী এবং তাদের খেতে হয় কম এবং বেছে বেছে। আর সেই কথাটিই

ঠাট্টা

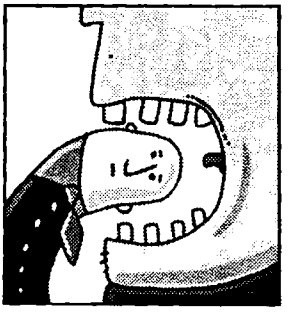

না হয় মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মুখ ফুটে বলেছেন, স্পষ্ট করে বলেছেন। আরে, উনি তো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো উপদেশ দিয়েছেন আমাদের!

বাণিজ্যমন্ত্রী কত বড় উপকারের কথা বলেছেন আমাদের, তা যদি আমাদের মতো নাদান পাবলিক বুঝত! এখন প্রতিটা খাবারে বিষ মেশানো। মাছে ফরমালিন, ফলে ফরমালিন, সবজিতে ফরমালিন, সব কিছুতেই ফরমালিন। এমনকি ইফতারে যে খেজুর খাই, তাতেও ফরমালিন মেশানো হচ্ছে। এসব খাবার খেয়ে আমাদের কিডনি নষ্ট হচ্ছে, ফুসফুসে ঘা হচ্ছে, পিত্তথলিতে ক্যানসার হচ্ছে, চোখের আলো কমে আসছে, জানা-অজানা আরও কত রোগ হচ্ছে। খাবার কম খাওয়া মানে এসব খাবার কম খাওয়া। আর এসব খাবার কম খাওয়া মানে রোগ-বালাই কম হওয়া। রোগ-বালাই কম হওয়া মানে বেশি দিন বাঁচা। বেশি দিন বাঁচা মানে বেশিদিন দেশের সেবা করা। কী অমূল্য একটা কথা বলেছেন তিনি। আর সেই কথাটাকে কি-না মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানি জনাব কাদের সিদ্দিকী ঠাট্টা বলে চালিয়ে দিলেন! তিনি কি তার এলাকার অসমাপ্ত ব্রিজের মতো ভেবেছেন সবকিছু। আমরা সিদ্দিকী সাহেবের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

২.

গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পাওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের জীবনে। আমরা যারা মিরপুরের রূপনগরে থাকি, তাদের প্রথম সেহরিটা খেয়েছি অন্ধকারে, প্রথম ইফতারিও করেছি অন্ধকারে। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে কোনো সভ্য জাতি সভ্য মানুষ এ রকম অতুলনীয় সুযোগ পেয়েছে কি-না তা জানা নেই। ব্যাপারটা গিনেজ বুক অব রেকর্ড কর্তৃপক্ষকে জানানো দরকার, খুব দ্রুত জানানো দরকার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ইফতার ও সেহরির সময় লোডশেডিং সৃষ্টির জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। 'বাচ্চারা, বলো তো, যা কেবল শোনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না, সেটা কী?' শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন। সহজ প্রশ্ন শুনে সব ছাত্র একসঙ্গে হাত তুলল। স্যার ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল ছেলেটাকে বললেন, 'তুমি বলো।' ছাত্রটি ভালো পড়া পারার মতো করে বলল, 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।'

৩.

একটি স্বপ্ন-গল্প

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ফারুক খান বাসায় ইফতারি করবেন। দ্রুত কিছু ইফতারি কেনার জন্য সোনারগাঁও হোটেলের ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কাউন্টারে দাঁড়ালেন।

'স্যার, আপনার কী লাগবে?' বিনয়ী কণ্ঠে এক সার্ভিসম্যান বললেন।

'আমাকে ১০০ গ্রাম জিলিপি, ৫০ গ্রাম বুন্দিয়া, ৭৫ গ্রাম ছোলা, ২৫-৩০ টাকার কাবাব, ২০ গ্রাম মুড়ি, ৩টা বেগুনি, ৫টি পেঁয়াজু দিন।'

চোখ বড় করে সার্ভিসম্যান তাকালেন। বাণিজ্যমন্ত্রী এবার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'সবাইকে কম খেতে বলেছি। সেখানে আমি নিজেই যদি বেশি খাই তাহলে কেমন একটা অসভ্যতা হয়ে যায় না! তাই—।' বাণিজ্যমন্ত্রী হাসতে লাগলেন। তার মুখে পুরো একটা সফল বাণিজ্যমন্ত্রীর হাসি!'

তিন ম নিয়ে এখনও আলোচনায় আছি আমরা—মনমোহন সিং, মেসি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এই তিন ম ছাড়াও আরও অনেক ম আছে আমাদের দেশে। প্রতিদিন আমাদের দেশে কারণ-অকারণে মামলা হয় কয়েক হাজার। এই মামলাময় ম নিয়ে অনেকেই ব্যস্ত। অনেকের মাথায় মগজ বেশি, তারা ব্যস্ত মগজ চর্চায়। অনেক মন্ত্রীর কথায় আমরা মজা পাই, আমরা এই ম নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্যও করি। আবার মতলব নিয়ে আমাদের অনেকের সারাদিন কাটে, এই ম-এ আচ্ছন্ন থাকি আমরা অনেকেই। অনেকে আবার মন-এর ম নিয়ে উথালপাথাল সময় কাটায় সারাক্ষণ।

মনোরঞ্জনের তেলবাজ হিসেবে আমাদের বেশ সুনাম আছে, অনেকে কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতনকে মনোরঞ্জনে মাতিয়ে দিই তেল মারতে মারতে। মনোরঞ্জনের ম কিন্তু বেশ মধুময়। অনেকে মর্যাদাবান হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, অনেকে মশগুল থাকে বিভিন্ন ধান্ধামিতে। মশা আর মশারি নিয়ে কোনো কোনো দম্পতি ঝগড়া করে রাত-বিরাতে। অনেকে সারাদিন খারাপ কাজ করে দিনশেষে মহৎ সাজার চেষ্টা করে, অনেকে জীবনে মান উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, অনেকে মার খায়, অনেকে দেয়; অনেকে মালামাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে এ মার্কেট থেকে ও মার্কেটে। অনেকে জীবনের মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে মান-অভিমান করে জীবনের সঙ্গে, অনেকে মুখের জন্য মুখিয়ে থাকে সারাক্ষণ। মুচকি হাসি দিয়ে কেউ কেউ তার স্বার্থ আদায় করে, কেউ আবার সবকিছুতেই মুগ্ধ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কারও আবার অনেক মুদ্রাদোষ আছে। মাংসের ক্ষেত্রে অনেকে মুরগির মাংস খেতে পছন্দ করে, কেউ গরু ভেবে মহিষের মাংস খেয়েও তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন। কারও কারও ব্যবহারে কেউ মূক হয়ে যায়, কেউ মেজাজ হারিয়ে যায় মূর্ছা।

প্রয়োজন ৩টি ম

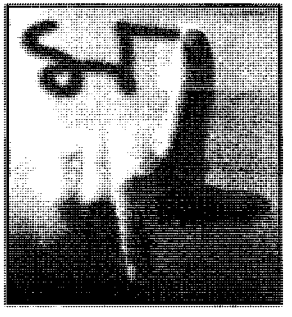

কেউ মেদ-ভুঁড়ি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন, কেউ আবার চুলে মেহেদি লাগিয়ে রঙিন করেন চেহারা।

মূল কথা হলো, ম অনেক মূল্যবান, ম ছাড়া আমাদের জীবনটাই ম্লান।

কিন্তু কোন ৩টি ম আমাদের খুব জরুরি? ফেসবুকে জানতে চাওয়া হয়েছিল ব্যাপারটা। শুচিস্মিতা সিমন্তি বলেছেন, মানুষ দরকার, সত্যিকারের মানুষ, বাকি ২ ম পরে ভাবা যাবে। জাহেদুল আলম জাহেদ বলেছেন মহৎ মনের মানুষের কথা। মা, মাটির আর মানুষের কথা বলেছেন সুদীপ দেব। এই কথাটি পছন্দও করেছেন সবচেয়ে বেশি মানুষ। তৌফিক মিথুন চেয়েছেন ৩ ম-এর পরিবর্তন, মানে ৩ মিনিস্টারের অপসারণ। তবে কোন ৩ জন, তা বলেননি। শুচিস্মিতা সিমন্তি আবার বলেছেন, তিনজন না, আরও অনেককেই বের করে দেওয়া দরকার।

মেধা, মনুষ্যত্ব আর মানবতার কথা বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছেন সোমা নূর। রাওয়ান খান নম্বর দিয়ে বলেছেন—১. মিনিস্টার রিজাইন ২. মনমোহনের সঙ্গে চুক্তি ৩. মিউচ্যুয়াল অ্যান্ড সেইফ পলিটিক্স। মতৈক্য, মনুষ্যত্ব আর মেধার কথা জানিয়েছেন শাহিন মাহমুদ। একই রকমভাবে মেধা, মানবতা আর মূল্যায়নের কথা জানিয়েছেন সাবিন লিমা। মাহমুদুল হাসান একটু রূঢ়ভাবে বলেছেন, মানবতা যেখানে হুমকির মুখে সেখানে আপনি শত 'ম' এনেও কিছু পরিবর্তন করতে পারবেন না। তার চেয়ে আগে নিজে পাল্টাই, সমাজ আপনা-আপনি পাল্টাবে। খাঁটি বাংলায় নজরুল ইসলাম বলেছেন, মাইর, মাইর আর মাইর-এর কথা, সবাই দুর্নীতিবাজ বলে। মেধা, মানবতা আর মুক্তি চেয়েছেন রাজিন রিশাত। ম-এর ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বাঁধন সাহা সারল্যাবোধ, মানবতা আর বন্ধুত্বের কথা লিখেছেন। রাজীব মাহবুব মুর্শেদ বেশ অন্যরকমভাবে জানিয়েছেন, ১. মা, মাটি, মানুষের প্রতি মমতা ২. মেধা, মনন আর মনুষ্যত্বে মহীয়ান মানুষ ৩. মানবিক, মূল্যবোধ ও ভালো মানুষের মূল্যায়ন। চমৎকার ব্যাখ্যা। ম্যাডাম, ম্যাডাম, ম্যাডাম লিখে হারুন মোর্শেদ সাজু কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা ঠিক বোঝা যায়নি। দুঃখিত সাজু।

জিএম আকতারুজ্জামান হীরণ বলেছেন তিন ব্যক্তির কথা—মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ আর মোহাম্মদ আশরাফুল। আরফান উদ্দিন ছোট্ট রূপক একটা গল্পের শেষে বলেছেন, যেমন ইন্ডিয়া থেকে কেউ এসে চোখ দেখানো কিছু দিয়ে বিশাল কিছু নিয়ে যাচ্ছে।

মেধা, মনন আর মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার কথা বলেছেন মাসুদুর রহমান। মনুষ্যত্ব, মানবতা, মমতা নিয়ে আলোচনা করতে চাননি ইনোসেন্ট হার্ট। তিনি বলেছেন, আমাদের কাজই এই ৩ মকে নিয়ে আলোচনা করা, যদি আমরা চাই।

ইনোসেন্ট আদিব আবার এসব নিয়ে ভাবতে চাননি। তার মতে, নিজে ঠিক তো দুনিয়া ঠিক।

কোনো ম-এর নাকি দরকার নেই আমাদের, দরকার R, মানে রেভল্যুশন। বলেছেন তন্ময় শাহরিয়ার। যোগ্য নেতৃত্বের কথা লিখেছেন আবদুর রহমান সালেহ। মা, মাটির আর মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন নিত্যানন্দ রায়। মডিফাইং, মডিফাইং আর মডিফাইং চেয়েছেন সেঁজুতি শুভ আহমেদ।

৩ মকে পরিবর্তন করে কোনো লাভ নেই। আমাদের সব রাজনৈতিক দল এবং তাদের বীজ নষ্ট করতে হবে, বলেছেন তন্ময় দত্ত। তিন ম নিয়ে আবার মাতামাতি করতেও নারাজ তপু ওয়াইল্ড, 'ওরা আমাদের জন্য কিছুই করবে না। যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

নাজমুল হক জুয়েল, জীবন শাহ, কষ্ট বিলাসী, তানজিনা ইভা, প্রবাল আহমেদসহ আরও অনেক চেতন ব্যক্তি মতামত দিয়েছেন।

মা, মাটি, মেধা মনন, মনুষ্যত্ব, মাতৃভূমি, মুক্তি, মমতা, মতৈক্য—এ সবকিছু নিয়েই মানুষ, মানুষকে নিয়েই এসব আবর্তিত। কে না জানে মানুষ না থাকলে এসব থাকত না। এই পৃথিবীটা একটু একটু করে সভ্য করেছে মানুষ, বাসযোগ্য করেছে মানুষ—দায়িত্বশীল মানুষ, সততাময় মানুষ, মানবিক মানুষ। মানুষ সব পারে, অমানুষকে মানুষ করতে পারে, যন্ত্রকে বানাতে পারে বন্ধু। জ্যোৎস্নাকে বুকে জড়িয়ে আলোকিত করতে পারে অনেক অন্ধকার। সব পারে মানুষ, স-ব।

১ জন মানুষ=কত জন মানুষ?

অঙ্ক শাস্ত্রের পণ্ডিত যাদব চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে ওপরের বাক্যটি দেখে চোখ দুটো সরু করে ফেলতেন, কপাল কুঁচকে ফেলতেন, বসে পড়তেন গভীর ভাবনায়, ভাবতেন গালে হাত লাগিয়ে। শেষে কোনো কিছুর কূলকিনারা করতে না পেরে নির্ঘুম রাত কাটাতেন অস্থিরতায়। তার মতো মানুষকে কি এভাবে চিন্তায় রাখা ঠিক হতো? মোটেই না। যেহেতু উত্তরটা আমাদের জানা দরকার, সেহেতু স্বর্গ থেকে তাকে আমরা কিছুক্ষণ আমাদের মাঝে আসার অনুরোধ করতে পারি, সবাই মিলে একটা সত্যি গল্প শোনাতে পারি তাকে। তারপর ওনার মুখ থেকেই শুনব—১ জন মানুষ=কত জন মানুষ?

শিশুটি তীব্র চিৎকার করছে, জানান দিচ্ছে সুকান্তের ভাষায়–পৃথিবীতে এসেছে সে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। ঠিক তখনই কেঁপে উঠেছে সারাদেশ, কেঁপে উঠল পঞ্চগড় শহরের সিটি জেনারেল হাসপাতাল। সবাই টের পেলেন, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। অস্ত্রোপ্রচার তখনও চলছিল, মায়ের বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়নি সে, নাড়ি কাটা হয়নি তখনও তার। চিকিৎসক কমলাকান্ত বর্মণ, খ ম আরিফুর রহমানসহ অস্ত্রোপ্রচার কক্ষের সবাই হুড়মুড় করে জীবন বাঁচাতে দৌড়ে চলে যান বাইরে। কিন্তু একজন তখনও দাঁড়িয়ে, নাড়ি কাটা হয়নি শিশুটির। কোলের মাঝে পরম মমতায় শিশুটিকে নিয়ে সেবিকা আর্জিনা খাতুন তখন স্রষ্টাকে ডাকছেন। ডাকতে জানলে স্রষ্টা সবার ডাক শোনেন, আর্জিনা খাতুনের ডাকও শুনেছেন। বেঁচে আছেন তিনি, বেঁচে আছে শিশুটিও। স্বার্থপরতায় জড়ানো নয়, নিঃস্বার্থ স্বরে আর্জিনা খাতুন বলেন, 'শিশুটিকে ফেলে রেখে গেলে হয়তো মা ও শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে–এই ভেবে এখানেই থেকে যাই। তাছাড়া তখনও শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। শিশুটিকে নিয়ে বেরও হতে পারছিলাম না। মনস্থির করলাম, যা হওয়ার হবে, বাইরে যাব না। ভূমিকম্পে অস্ত্রোপচারের টেবিল থেকে যখন যন্ত্রপাতিগুলো মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আল্লাহর নাম নিচ্ছিলাম।'

১ জন মানুষ = কতজন মানুষ

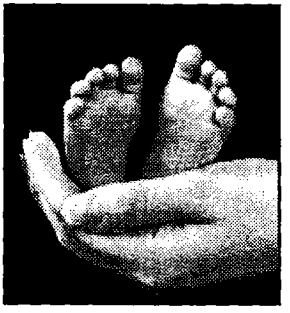

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মা সুলতানা বেগম অবাক চোখ আর কৃতজ্ঞচিত্তে তাকালেন আর্জিনা খাতুনের দিকে। দু'চোখে পানি তার—সেটা মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার পানি, না মানুষের স্বার্থপরতায় পানি, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। গল্প শেষ। যাদব চক্রবর্তী বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, '১ জন সেবিকা আর্জিনা খাতুন=বর্মণ, আরিফুরের মতো সারাদেশের সব স্বার্থপর ডাক্তার।' তাই শুনে হাসপাতালের পরিচালক জাহিদুল ইসলাম বললেন, 'আর্জিনা দৌড়ে বাইরে না এলেও এমন ঘটনায় সবাই কিন্তু আগে নিজের জীবন বাঁচাতে চায়।'

জাহিদের কথাটা শুনে যাদব বাবুকে আমরা আরেকটা সত্যি গল্প শোনাব।

মা টের পেলেন, তার হাতে রাখা দুধের বোতলটা কেমন যেন কেঁপে উঠল একটু, কেঁপে উঠল বোতলের ভেতরের দুধটুকুও। মা খেয়াল করলেন, না, কেবল বোতল আর দুধটুকুই কেঁপে ওঠেনি; কেঁপে উঠছে ঘরের টেবিল, চেয়ার, দেয়ালে ঝোলানো ছবি, সব শেষে পুরো ঘরটাই। ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে, প্রচণ্ড ভূমিকম্প! মা দ্রুত তার তিন মাস বয়সী শিশুটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভূমিকম্পের পর জাপানের উদ্ধারকারী দল মায়ের বাড়ি পৌঁছে দেখল, মারা গেছে মা। ছোট একটা গর্তের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দলনেতা বুঝতে পারলেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীরটা। কিন্তু মহিলার ভঙ্গিটা অদ্ভুত লাগল তার কাছে। কেমন যেন উপাসনার ভঙ্গিতে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে আছেন তিনি। মনে হচ্ছে, কিছু একটা আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি দু'হাতে।

মাকে মৃত দেখে ফিরে আসছিলেন উদ্ধারকারী দলটি। কী মনে করে দলনেতা ঘুরে দাঁড়ালেন। গর্তের ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে মাথাটা ঢুকিয়ে দিলেন তারপর। মার শরীরটা একটু কাত করতেই চমকে উঠলেন তিনি এবং চিৎকার করে উঠলেন, 'একটা শিশু, একটা শিশু...।'

পুরো দল দ্রুত সজাগ হয়ে উঠল। তার চেয়েও দ্রুত ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে দেখল, মার শরীরের নিচে কম্বলে পেঁচানো একটি শিশু। তিন মাস বয়সী শিশুটি বেঁচে আছে তখনও!

ঘরটি ভেঙে পড়ার সময় বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য আড়াল করে রেখেছিল মা তার শরীর দিয়ে। ভেঙে পড়া বাড়িটি থেতলে দিয়েছে তার মাথা আর পেছনের দিকটা। কিন্তু শিশুটি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তখনও।

কম্বলটা খুলে ফেললেন উদ্ধারকারী দল। একটা মোবাইল রাখা আছে সেখানে, একটা মেসেজ লেখা স্ক্রিনে—যদি তুমি বেঁচে যেতে পার, তাহলে মনে রেখ, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

গল্প শেষ। টলটল করছে যাদব চক্রবর্তীর দুটো চোখ। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে তিনি বললেন, '১ জন মা=সারা পৃথিবীর সব ভালোবাসা।' আর কোনো কথা বলতে পারলেন না যাদব বাবু। কেঁদে উঠলেন শব্দ করে। তারপর মাথা নিচু করে হেঁটে যেতে লাগলেন স্বর্গের দিকে।

'না, কোনোভাবেই মানুষকে আর ভিক্ষা করতে দেওয়া হবে না। এদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হবে। আমরা চেষ্টা করব তাদের কল্যাণের জন্য যদি কিছু বরাদ্দ দেয় সরকার, সত্যিকারের ভিক্ষুক আই মিন আসল ফকির বাছাই করে তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে তা।' গলার সবগুলো রগ ফুলিয়ে ঘরোয়া সভায় কথাগুলো বললেন মিনহাজ পাটোয়ারী। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তিনি। সমাজসেবক, দানবীর এবং দলের সভাপতিও। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত '১০ হাজার ভিক্ষুক খোঁজা' শীর্ষক সভায় বক্তব্য রাখছিলেন তিনি।

'মানুষ হয়ে মানুষের কাছে হাত পাতবে, এটা একটা কথা হলো! সভ্য সমাজে এটা একটা অসভ্যতা। না, কোনোভাবেই মানুষকে আর ভিক্ষা করতে দিতে পারি না আমরা। ভিক্ষুক হলো সমাজের শত্রু। ভিক্ষা করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' আগের বক্তার চেয়ে জোরালোভাবে কথাগুলো বললেন শৃঙ্খলা বজায় রাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব বাতেন পেশোয়ার।

'আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে চাই, দেশে ভিক্ষুক সংখ্যা বাড়া মানে দেশকে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষুকে পরিণত করা। না, এটা আমরা চাই না। আমাদের এই সোনার দেশকে আমরা সোনার মতোই রাখতে চাই, আমরাও সোনার টুকরা হয়ে একেকজন বাঁচতে চাই।' বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব কেরামত জাহাঙ্গীর। দলীয় তেলাতেলি আর বুদ্ধি বিকিয়ে দিয়ে তিনি এখন সমাজের গণমান্য ব্যক্তিদের একজন।

'সবার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। তবে আরও কিছু যোগ করতে চাই আমি। আমাদের দেশে, সমাজে, হরেক রকম ভিক্ষুক রয়েছে। তাই আসল ভিক্ষুক খুঁজে বের করা হবে আমাদের প্রথম কাজ। কিন্তু কীভাবে এই আসল ভিক্ষুক খোঁজা হবে?' সবার কাছে প্রশ্ন রেখে বক্তব্য

আসল ভিক্ষুক

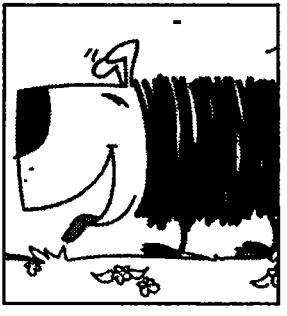

শেষ করেন হায়াত সর্দার। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তিনি। সবাই তাকে এক নামে পরামর্শদাতা বলে চেনেন।

সভা শেষে সবাই একমত হলেন—দেশে বিভিন্ন রকম ভিক্ষুক আছে। কিন্তু কোন ভিক্ষুকটা আসল, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। আসল ভিক্ষুক খুঁজে বের করা না গেলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। সুতরাং আসল ভিক্ষুক খুঁজে বের করতে হবে আগে। জনপ্রতিনিধি মিনহাজ পাটোয়ারী খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আসল ভিক্ষুক বের করার জন্য তাহলে কী করা যায় বলুন তো?'

'এ বিষয়ে আমরা আরেকটা প্রজেক্ট হাতে নিতে পারি। প্রজেক্ট সাবমিট করতে পারলে তো টাকা কোনো ব্যাপারই না।' শৃঙ্খলা কমিটির বাতেন পেশোয়ার বললেন।

'কিন্তু প্রজেক্টের পর প্রজেক্ট হাতে নিলে তো কাজের কাজ কিছুই হবে না।' বুদ্ধিজীবী কেরামত জাহাঙ্গীর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এসব আসল ভিক্ষুক খোঁজার জন্য কোনো মেশিন-টেশিন বের হয়েছে নাকি বিদেশে? তাহলে একটা বাজেট করে মেশিনটা কিনে আনতে পারতাম।'

'কথাটা খারাপ বলেননি আপনি। এত বড় একটা কাজ, সেটা হেলাফেলাভাবে করা তো ঠিক হবে না। এতে অন্যায় হবে আমাদের। প্রয়োজন হলে আমরা আরও টাকা বরাদ্দের দাবি জানাব। কিন্তু কাজটা আমাদের সঠিকভাবে করতেই হবে, সফল আমাদের হতেই হবে।' পরামর্শক হায়াত সর্দার বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বললেন।

'কিন্তু আসল ফকির তো খুঁজে বের করা খুব মুশকিল?' মিনহাজ পাটোয়ারী বললেন।

'আমার মনে হয় তেমন মুশকিল হবে না।' বাতেন পেশোয়ার চোখ দুটো উজ্জ্বল করে বললেন, 'আমার জানা-শোনা এক বাবা আছেন, অত্যন্ত কামেল মানুষ। সব কাজ উনি পানির মতো করে দেন। আশা রাখি আসল ফকির খুঁজে বের করার ব্যাপারেও তিনি ভালো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন তিনি আমাদের।'

'এ কাজটা করে দেওয়ার জন্য ওনাকে কত দিতে হবে আমাদের?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কেরামত জাহাঙ্গীর।

'আমরা যা দেব, উনি তা-ই নেবেন।' আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললেন বাতেন পেশোয়ার।

সবাই একমত হয়ে বাবার কাছে গেলেন। খুব মনোযোগ দিয়ে সবার কথা শুনে বাবা বললেন, 'আসল ফকির কাকে বলে আপনারা জানেন তো?' পরামর্শক হায়াত সর্দার

বললেন, 'জানি তো। যাদের কোনো ঘরবাড়ি নেই, রাস্তাঘাটে রাতে ঘুমায়, হাঁড়িতে ভাত রান্না হয় না যাদের।'

'যারা ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরে থাকে, যাদের পায়ে কোনো জুতা নেই, যারা প্রায়ই না খেয়ে থাকে, তারাই আসল ফকির।' মিনহাজ পাটোয়ারী গড়গড় করে বলে ফেলেন।

'তা ছাড়া—।' কেরামত জাহাঙ্গীর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিলেন বাবা, 'আমি জানি, আপনি ওনাদের মতোই বলবেন। কিন্তু আসল ফকির তারা না। আসল ফকির হচ্ছে তারা, যাদের অনেক টাকা থাকার পরও আরও টাকা রোজগার করে অবৈধভাবে; যারা বাড়ির মালিক হয়েও সরকারি সুবিধা ভোগ করে আরও বাড়ির মালিক হয়; অসুখে জর্জরিত হয়ে খেতে না পারলেও যারা খাবার সাজিয়ে টেবিল ভরে ফেলেঃ যারা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবৈধভাবে ভোগ করে, তারাই আসল ফকির।' বাবা একটা পানির পাত্র সামনে এনে বললেন, 'আমি এই পানির পাত্রটা আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। এই পানি হাতে নিয়ে মানুষের দিকে ছিটিয়ে দেবেন। চেহারায় লাগার পর যদি কারও চেহারা না বদলে যায় যায়, তাহলে তিনি আসল ফকির না। যদি বদলে কোনো প্রাণীর মতো হয়ে যায়, তাহলে তিনিই আসল ফকির।' বাবা পাত্র থেকে কিছু পানি হাতে নিয়ে সামনের চারজনের দিকে ছিটিয়ে বললেন, 'পানি ছিটাতে হবে ঠিক এভাবে।' কিন্তু পানি ছিটিয়েই জিভ কাটলেন বাবা। তার সামনের চারজনেরই চেহারা পাল্টে গেছে, সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে!

ঘুম আসুক বা না আসুক, রাত রাড়ে ১১টার মধ্যে বিছানায় যান বাসার তরফদার। এরপর লাইটটা অফ করে দিয়ে মটকা মেরে শুয়ে থাকেন, জোর করে চোখ দুটো চেপে রাখেন, কখনও কখনও ভেড়া গোনেন, এর পরও ঘুম না এলে তিনি ছোটকালে শেখা ছড়া বলতে থাকেন—ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো...। না, মাসি-পিসি আসে না, ঘুমও আসে না। বাসার তরফদার একাত-ওকাত করেন, কোলবালিশ চেপে ধরেন, এরপর আরও কয়েকটা ছড়া বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েন একসময়।

খুব চমৎকার একটা অভ্যাস আছে বাসার তরফদারে। যত রাতেই ঘুমান না কেন, সকাল সকাল বিছানা ছাড়েন তিনি। কোনো রকম আলস্য করেন না এতে। আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে, চোখ ডলতে ডলতে পুবের খোলা জানালার দিকে তাকান।

ঘুম থেকে ওঠার পর তার প্রথম কাজই হচ্ছে—ঘরের ভেতর চল্লিশ মিনিট পায়চারি করা। এ পায়চারি করতে পারলে তার তিনটি সুবিধা হয়। এক. সারাদিন দুর্বল দুর্বল লাগে না, দুই. মাথার পেছনটা হালকা লাগে, ব্যথাও অনুভূত হয় না, তিন. ভালো বাথরুম হয়। তাই পায়চারি শেষ করার পর আধা মিনিটও অপেক্ষা করেন না তিনি, সরাসরি বাথরুমে চলে যান।

কিন্তু আজ চল্লিশ মিনিট পায়চারি করার পরও বাথরুমে ঢোকার কোনো লক্ষণ না দেখে মিসেস বাসার বললেন, 'কী ব্যাপার, আজ কি হাঁটা কম হলো তোমার?'

গোপন

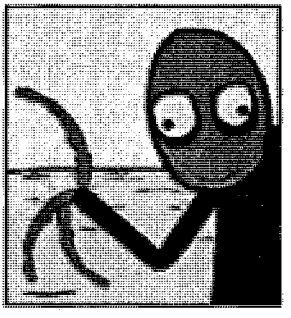

'না তো।'

'তাহলে চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী বাথরুমে যাচ্ছ না যে!' বিদ্রূপমাখা স্বরে বললেন মিসেস বাসার।

চমকে উঠলেন বাসার তরফদার। চোঁ করে উঠল তার পেটের ভেতরটা। ভয় পেয়ে তার পেটের ভেতর

এমন শব্দ করে ওঠে। স্ত্রীর দিকে ভালো করে তাকালেন তিনি। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন না। তার এ দীর্ঘমেয়াদি তাকিয়ে থাকা দেখে মিসেস বাসার কিছুটা চিৎকার দিয়ে উঠে বললেন, 'ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন তুমি, আমার মাথায় কি শিং গজিয়েছে?'

হাসার চেষ্টা করলেন বাসার তরফদার, 'শিং গজালে খুব একটা খারাপ হতো না। সামনে কোরবানির ঈদ না!'

রেগে যেতে নিয়েই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন মিসেস বাসার, 'তুমি কি ইদানীং কোনো ইলেকট্রনিকসের মার্কেটে গিয়েছিলে?' আগ্রহ নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকান বাসার তরফদার।

'ওই সব মার্কেটে আমি কখনও গিয়েছি? ওই সব মার্কেটে যাবইবা কেন? মরার সংসার করতে করতে ইদানীং কোনো শপিং মলেই যাওয়ার সময় পাচ্ছি না! টিভি-পেপারে দেখি, কত সুন্দর ড্রেস এসেছে মার্কেটে, আর আমি কি-না হেঁশেল ঠেলতে ঠেলতে মরছি।'

'তুমি না যাও, অন্য কাউকে কি পাঠিয়েছিলে?'

'অন্য কাউকে মানে!' মিসেস বাসার চিৎকার করে ওঠেন, 'তুমি কি সাত-সাতটা কাজের মানুষ দিয়েছ আমাকে! মানুষের বাড়িতে দু-তিনটা কাজের মানুষ থাকে, আর আমার বাড়িতে একটা। বাজারে যাও, এটা-ওটা কাটো, ঘর মোছো— হাজার রকম কাজ। আমার কাজ করার সময় কোথায় ওর!'

'তাহলে— ।' বাসার তরফদার এগিয়ে আসেন স্ত্রীর দিকে। আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করেন একটু, 'কোনো মিস্ত্রি জাতীয় কেউ কি বাসায় এসেছিল?'

'মিস্ত্রি জাতীয় লোক বাসায় আসবে কেন!' বিরক্তিকে চেহারা কুঁচকে ফেলেন মিসেস বাসার।

বাসার তরফদার আবার পায়চারি শুরু করেন। কয়েকবার পায়চারি করার পর কাজের মেয়েটাকে ডেকে বললেন, 'মরিয়ম, এক গ্লাস পানি দে, ঠাণ্ডা পানি দিবি। তোর কাছে ঠাণ্ডা চাইলে তো নরমাল পানি এনে দিস। ঠাণ্ডা ঠিকমতো না হলে কিন্তু লাথি দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেব।'

নিজের কথায় নিজেই অবাক হয়ে গেলেন বাসার তরফদার। তিনি তো সাধারণত এভাবে কথা বলেন না। মাথাটা কি গরম হয়ে গেল তার! বাসার সাহেব একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করলেন, শুধু মাথা নয়, পুরো শরীরই গরম হয়ে গেছে তার, প্রচণ্ড গরম। সবচেয়ে বেশি গরম হয়ে গেছে পেটটা।

মরিয়ম হন্তদন্ত হয়ে পানি এনে দাঁড়াল বাসার তরফদারের সামনে। তরফদার গ্লাসটা মুখে দিয়ে এক চুমক খেয়ে বাকিটুকু ফেরত দিলেন মেয়েটাকে। ঘামছেন

তিনি। ধপাস করে বসে পড়লেন তিনি সোফায়। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস তরফদার দৌড়ে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কী হয়েছে তোমার? এভাবে ঘামছ কেন তুমি?'

'আমার ঘাম শুকিয়ে যাবে সুফিয়া।' স্ত্রী হাত জড়িয়ে ধরলেন বাসার তরফদার, 'তার আগে বলো—বাসায় কোনো ইলেকট্রনিক জিনিস কিনে আনোনি তুমি ইদানীং?'

'কিসের ইলেকট্রনিক জিনিস আনব আমি! সেই কখন থেকে মিস্ত্রি, ইলেকট্রনিক মার্কেট, ইলেকট্রনিক জিনিস নিয়ে বকবক করছ। আমি বুঝতে পারছি তোমার প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে, ওখান থেকে ঘুরে আসো তো। ঘেমে একেবারে গোসল করে উঠেছ!'

স্ত্রীর দুটো হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বাসার তরফদার কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'এবার সত্যি করে বলো তো, বাথরুমের ভেতর কোনো গোপন ক্যামেরা লাগাওনি তো তুমি?'

'এটা কি বলছো তুমি! বাথরুমের ভেতর গোপন ক্যামেরা লাগাব কেন আমি?'

'বউরে, আজকাল মানুষের হাতে হাতে মোবাইল, হাতে হাতে ক্যামেরা। তারপর আবার প্রায় প্রতিটা মার্কেটে, অফিসে হিডেন ক্যামেরা। হাত ধরলে সেটা ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়, অন্য আর সব তো হয়ই। তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে, সবার মোবাইলে, সবার কম্পিউটারে। জীবনটা একেবারে তছনছ হয়ে যায় তখন।'

'আমি তোমার স্ত্রী, আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না!'

'আজকাল কেউই আর বিশ্বাসী নেই বউ, সবাই কেমন যেন মুখোশ পরে আছে। ওই যে কয়দিন আগে—।' কথাটা শেষ করতে পারলেন না বাসার তরফদার। চাপটা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। দ্রুত তিনি ঢুকে পড়লেন বাথরুমের ভেতর।

কমোডে বসেই আবার ঘামতে লাগলেন বাসার তরফদার। মাথা একবার এদিকে ঘোরান, আবার ওদিকে ঘোরান, ওপরে তাকান, নিচে তাকান– হায়রে, ক্যামেরাটা যে কোথায় লুকানো আছে!

দুইশ পাঁচ গ্রাম গাঁজাসহ পিয়ার হোসেন নামের এক গাঁজা বিক্রেতাকে মুন্সীগঞ্জের মীরকাদিম পৌরসভার তিলারদিচর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে পাঁচবারের মতো পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন তিনি। তার বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা রয়েছে। সেগুলোর নিষ্পত্তি না হতেই গত ১৮ অক্টোবর রাতে আরেক দফা হাতকড়া পরিয়েছে পুলিশ তাকে।

খুব সাধারণ একটা খবর, দেশের খবর। আরও অনেক খবর প্রকাশ হয়েছে দেশে, হরেক রকম খবর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—পিয়ার হোসেন কোন পেয়ারে পড়ে গাঁজা বিক্রি করতে গেলেন? আমরা এ নিয়ে কোনো একটা গোলটেবিল বৈঠক করতে পারতাম কিংবা কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনা অনুষ্ঠান অথবা কোনও বিখ্যাত স্থাপত্যের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারতাম। আজকাল কিছু হলেই তো অনেকেই শহীদ মিনারে যান, বক্তৃতা দেন, ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সিঁড়িতে বসে থাকেন দেশের সব সমস্যা সমাধান করতে না পারার চিন্তাযুক্ত চেহারায়। অবশ্য এতে কোনো ফলপ্রসূ ব্যাপার না আসুক, মিডিয়ায় প্রচার পাওয়া যায় বেশ। যে দেশের মিডিয়ায় খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, লুটপাট, দুর্নীতি, চাপাবাজি—সব রকম নষ্টামির কথা প্রতিদিনই ঘুরেফিরে আসে, সেখানে পবিত্র শহীদ মিনারের ছবিসহ খবরগুলো বেশ গুরুত্ব নিয়েই ছাপা হয়।

গাঁজাখুরি কারবার

● পিয়ার হোসেন কোন পেয়ারে পড়ে গাঁজা বিক্রি করতে গেলেন– আমরা কয়েকটা বিষয় উত্থাপন করতে পারি আপাতত।

● এককালের প্রতাশালী নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি মারা গেলেন কী অপমানজনকভাবে! পিয়ার হোসেন এই শোকে গাঁজা নিজে ভোগ না করে গাঁজামুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

● শেয়ারবাজার কাউকেই পেয়ার করছে না—কিন্তু কেন? পেয়ার হোসেন এটা মেনে নিতে না পেরে শেয়ার বিক্রি না করে গাঁজা বিক্রি করছিলেন।

● পদ্মা সেতুর ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, এতে বহির্বিশ্বে দেশের কোনো ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি। ভাবমূর্তি নষ্ট না হওয়ার আনন্দে পেয়ার হোসেন আর ওই খারাপ জিনিস খাবেন না বলে ঠিক বিক্রি না করে কোথাও ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন ওই শুকনো জিনিসগুলো।

● ঢাকাকে ভেঙে দুটি সিটি করপোরেশন, দুজন প্রশাসক, দুটি ভবন, দুটি প্রশাসন, দুটি টেন্ডার বক্স, দুই জায়গায় লুটপাট—সব কিছুই কেমন দু'নম্বর হয়ে যাচ্ছে, এই দুঃখে নিজের কাছে রাখা শুকনো পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে কোথাও যাচ্ছিলেন পেয়ার হোসেন।

● নকল টাকা তৈরির চক্র ধরা পড়ছে ইদানীং। কিন্তু দেশে তো অনেক নকল মানুষ আছে, নকল ক্ষমতাবান আছে, নকল মানসিকতার নেতা আছে, তারা কেন এখনও ধরা পড়ছে না, তারা কেন এখনও টিকে আছে– এই দুঃখে কোনো গোপন স্থানে ইচ্ছামতো টানতে যাচ্ছিলেন পিয়ার হোসেন।

ওপরের কোনটিতে টিক চিহ্ন দেবেন আপনি? যেটাতেই দেবেন, ভুল হবে আপনার। দেখুন স্বয়ং পিয়ার হোসেন কী বলেছেন—'চারটি মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে আসছি। একবার হাজিরা দিতে গেলেই উকিলকে শত শত টাকা দিতে হয়। এখন গাঁজা বিক্রি না করলে উকিলের টাকা পাবো কোথায়? তাই উকিলের টাকা জোগাতে গাঁজা বিক্রি করছি।'

মানুষকে সম্মান জানানো একটা মহৎ গুণ। পিয়ার হোসেন একজন মানুষ। আসুন, যেভাবেই হোক, তাকে একটু হলেও সম্মান জানাই আমরা। কারণ সত্য কথা বলেছেন তিনি। আজকাল সত্য কথা কে বলে! সবাই যার যার মতো বলে যাচ্ছে। কিন্তু কোনটা যে সত্য, কোনটা যে মিথ্যা বলা মুশকিল! না হলে বিশ্বব্যাংক যা বলে, সেদিকেই কি তাকিয়ে থাকি না আমরা!

এবার একটা কোটি টাকার প্রশ্ন। পিয়ার হোসেন না হয় গাঁজার মতো আদি, অকৃত্রিম, তৃতীয় শ্রেণীর একটা নেশাদ্রব্য বিক্রি করতে গিয়েছিলেন, পুলিশ তাই তাকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু কেউ কেউ তো দেশের সম্মান বিক্রি করছে প্রতিনিয়ত, কেউ কেউ তো দেশের স্বার্থ বিক্রি করছে ইচ্ছামতো, কেউ কেউ তো জনগণের অধিকার বিকিয়ে দিচ্ছে মনের খায়েশ মিটিয়ে, কেউ কেউ তো যা মনে চায় তা-ই করছে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরছে না কেন?

ক.

খ.

গ.

ওপরের তিনটি পয়েন্টে আপনারা আপনাদের ইচ্ছামতো তিনটি পয়েন্ট লিখে নিন। না, এতে কোনো দোষের কিছু নেই। কারণ, আজকাল সব কিছুই তো যার যার ইচ্ছামতো চলছে। আপনারটা চললে দোষ কি!

বাশার সাহেবের বড় মেয়ের অনেক সমস্যা এবং সমস্যাগুলো বেশ জটিল। তার প্রধান তিনটি সমস্যা হলো—০১. প্রতি সপ্তাহে তার সারাশরীর আধা ঘণ্টা ম্যাসাজ করতে হয়। আগে সেটা কোনো পার্লারে গিয়ে করাত সে। গোপন ক্যামেরা সংক্রান্ত ঘটনার পর এখন বাসাতেই করায়। সমস্যা হলো—এতে সে পার্লারের মতো তত আরাম পায় না। সারাক্ষণ মেজাজটা তাই খিটখিটে থাকে তার। ০২. তিন বেলায়ই তার মুরগি চাই। সকালে মুরগির স্যুপ, দুপুরে মুরগির রেজালা, রাতে ফ্রাই। মুরগি ছাড়া অন্য কিছুতে রুচি নাই তার। বড় মাছ, ছোট মাছ, গরুর মাংস, খাসির মাংস—কোনোটাতেই না। সমস্যা হলো, ইদানীং চোখে কম দেখে সে। ডাক্তার বলেছেন, প্রচুর শাকসবজি ও মাছ খেতে। বিশেষ করে ছোট মাছ। কিন্তু মুরগি ছাড়া অন্য কিছু তার পেটে পড়লেই বমি হয়ে যায়। ০৩. তিন নম্বর হলো—স্বাস্থ্যগত সমস্যা। মেয়েটা যতটা না লম্বা, তার চেয়ে বেশি ডানে-বাঁয়ে বেড়ে যাচ্ছে সে। প্রস্থটা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গেছে, জামা বানাতে আগে লাগত আড়াই গজ কাপড়, এখন লাগে সাড়ে তিন গজ। এটা তেমন জটিল সমস্যা না, জটিল হলো—অনেক রিকশাওয়ালাই তাকে নিতে চায় না, তার জন্য অধিকাংশ সময় তাকে অনেক হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে যায় সে।

সমস্যাযুক্ত এই মেয়েটাই বিয়ে করে ফেলে একদিন, একা একাই। ছেলে দেখতে খারাপ না, চাকরিও করে বেশ ভালো। তবে সে দেখতে অনেকটা ফার্মের মুরগির মতো। বাসায় যতক্ষণ থাকে—খায়, ঘুমায় আর বাথরুমে যায়। বাশার সাহেব মনে মনে ভাবেন, তার মেয়ে একটা ফার্মের মুরগি, বিয়েও করেছে একটা ফার্মের মোরগকে! বড়ই অসন্তুষ্ট তিনি তাদের প্রতি। নতুন দম্পতি হবে প্রজাপতির মতো—উড়বে, বেড়াবে, নাচবে। তা না, ডিম না পাড়া মুরগির মতো খালি ঝিমায় আর ঝিমায়।

স্বর্ণের খাট

বাশার সাহেব অনেক ভেবেচিন্তে তাই সিদ্ধান্ত নেন—তার ছোট মেয়েকে তিনি তার পছন্দমতো বিয়ে দেবেন। পাত্র খুঁজতে থাকেন তিনি। ঘটকরা একেক সময় একেক ছেলের খবর আনে; কোনোটার ২৫ ভাগ পছন্দ হয়, কোনোটার ৫০ ভাগ, কোনোটার ৭৫ ভাগ। কিন্তু ১০০ ভাগ পছন্দের কোনো ছেলে পাওয়া যায় না। দুটি মাত্র মেয়ে তার। একটা ছয়তলা বাড়ি আছে, টাকা-পয়সারও কোনো অভাব নেই, গ্রামেও জমিজমা আছে কয়েক বিঘা। মেয়ে জামাই তাই একটু প্রতিষ্ঠিত হলে ভালো হয়। একটু ভালো বংশ, একটু ভালো আচার-আচরণ, একটু ভালো টাকা-পয়সা কামাবে—ব্যস, এটুকুই। আর কিছু দরকার নেই।

ঘটকরা পাত্র খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। অবশেষে সতেরটা ছেলে দেখার পর একটা ছেলে পাওয়া গেল। ১০০ ভাগ পছন্দ না হলেও প্রায় ৯৮ ভাগ পছন্দ হয়েছে তার। বাশার সাহেব আর দেরি করেননি। অনেক টাকা খরচ করে, অনেক মানুষ দাওয়াত দিয়ে, ধুমধামের সঙ্গে ঘটা করে বিয়ে দেন ছোট মেয়েকে।

কিন্তু মাস না ঘুরতেই স্বপ্ন ভঙ্গ হতে শুরু করল বাশার সাহেবের। যে ছেলেকে তিনি এত ভালো ভেবেছিলেন, সেই ছেলেই কি-না যৌতুক চেয়ে পাঠিয়েছে!

মনকে শান্ত করে ছেলের চাহিদা অনুযায়ী একটা ফ্ল্যাট টিভি ও বড় একটা ফ্রিজ কিনে পাঠালেন মেয়ের বাড়ি। তার স্ত্রীও সান্ত্বনা দিলেন তাকে, 'যাক, জিনিসগুলো তো মেয়ের ঘরেই গেছে, অন্য কোথাও তো যায়নি।'

মাস চারেক পরে জামাই আবার একটা ফর্দ পাঠাল—একটা কম্পিউটার আর একটা সেগুন কাঠের আলমারি। দাঁতে দাঁত চেপে সেটাও পাঠিয়ে দিলেন বাশার সাহেব। আর মনে মনে কষে একটা গালি দিলেন জামাইকে।

দীর্ঘ নয় মাস পর জামাই এবার ফর্দ পাঠাল না, সরাসরি স্ত্রীকেই পাঠাল—একটা মোটরসাইকেল, স্রেফ মোটরসাইকেল, আর কিছু না।

ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল বাশার সাহেবের। মেয়েকে নিয়ে তিনি সরাসরি তার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বিচার বসালেন। বিচারে ছেলের বাবা বললেন, 'ছেলের চাকরি ছিল, কিন্তু চলে গেছে সেটা। চাকরি-বাকরি নেই, সে এখন বেকার। তাকে একটা কাজকর্ম ধরিয়ে দেওয়া শ্বশুরের পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু তার তো কিছু সাধ-আহ্লাদ আছে, বেকার হলেও সে তো মানুষ। তাই...।'

ছেলের বাবার কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন বাশার সাহেব। শেষে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ছেলে বেকার তো কী হয়েছে! বিয়ের আগে না বলেছিলেন, আপনার ছেলে স্বর্ণের খাটে ঘুমায়। সেই খাট কই? বসে থেকে লাভ কী? সেটা বিক্রি করে একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করলেই তো পারে।'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে তো স্বর্ণের খাটেই ঘুমায়। আমার একমাত্র মেয়ের নাম স্বর্ণ। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সেই খাটে এখন আমার ছেলেই ঘুমায়!'

বচ্চন পরিবারের একমাত্র বধূ ঐশ্বরিয়া রাইয়ের যমজ সন্তান হবে এ দিনটিতে—এমন আশা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল বিশ্বের অনেকে। কিন্তু না, তা হয়নি। তবে এ দিনে একসঙ্গে পরপর চারটি যমজ সন্তান জন্ম দিয়েছে বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার হারিয়াকান্দি গ্রামের মালা বেগম। দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে। ভালো আছে তারা, মা ও সন্তানরা।

সিগারেট খাচ্ছে ছেলেটি। বারো কি সাড়ে বারো বছর। মুখে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছে ধোঁয়া। আনাড়ি। গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে জগতের সব চিন্তা চেহারায় এনে সে ঘন ঘন টান দিচ্ছিল তামাক শলাকাটিতে। বড্ড বেমানান। হঠাৎ স্বাস্থ্যবান এক প্রবীণ ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন ছেলেটির। হাসি মুখ করে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'বাপজান, দিনে কয়টা খাও?'

কোনো উত্তর দিল না ছেলেটি।

'তুমি কি কানে কম শোনো, বাপজান?' হাসি হাসি মুখ নিয়ে তিনি বললেন।

হাতের সিগারেটটা একটু একটু কাঁপছে, ছেলেটির। লুকানোর চেষ্টা চলছে। ধীরে ধীরে হাতটা চলে যাচ্ছে পেছনের দিকে।

'বাপজান, তোমার বাপ আছে না?' আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক্।

'আছে।' অস্ফুট স্বরে বলে সিগারেট হাতে ছেলেটি।

১১.১১.১১

'মোবাইল ফোন আছে না তার?'

'আছে।' ভয় মিশ্রিত কণ্ঠস্বর এবার।

'নম্বরটা দাও।' নিজের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে নম্বরটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ভদ্রলোক। কিন্তু ছেলেটির চোখে ভীতি, আতঙ্কও। ভদ্রলোক হাসির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'না, খারাপ কিছু বলব না তোমার বাবাকে। শুধু বলব,

আপনার ছেলেকে দামি সিগারেট কিনে দেবেন। ও তো রাস্তাঘাটে কম দামি সিগারেট কিনে খায়। কী— ।' ভদ্রলোক কৌতুকভরা চোখে বলেন, 'আমার কথা শুনে দামি সিগারেট কিনে দেবে না তোমার বাবা?'

কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেটটা পায়ের কাছেই ছেড়ে দেয় ছেলেটি। নাটক দেখার মতো অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে চারপাশে। সবার মুখেই কৌতুক দেখার হাসি। প্রবীণ ভদ্রলোক এবার গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। যদি আর কোনো দিন তোমাকে সিগারেট খেতে দেখি— ।' তিনি একটু থেমে বললেন, 'তাহলে তোমাকে কীভাবে শাস্তি দেব বলো? একটু ভেবে বলো।'

ছেলেটির চেহারায় ভাবনা, কিন্তু সেই ভাবনা আর শেষ হয় না। ছেলেটিকে কিছুটা ঠেলে দিয়ে তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, যাও। সিগারেট নিয়ে আবার যখন ধরা পড়বে, তখন দেখা যাবে কী শাস্তি দেওয়া যায়।'

মাথা নিচু করে চলে যায় ছেলেটি। প্রবীণ হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি জানি, ও আবার সিগারেট খাবে। কিন্তু একটা সিগারেট তো কম খাওয়াতে পারলাম।' বিজ্ঞের মতো হাসতে থাকেন তিনি, বলেন, 'প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করলে ৬০ বছরে একটা মানুষ কমপক্ষে একুশ হাজার ভালো কাজ করতে পারবে।'

১১.১১.১১-তে এই শুভ কথাটি শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল, অনেক ভালো। প্রতিদিন একটা ভালো কাজ, শুধু একটা ভালো কাজ। স্রষ্টার কাছ থেকে ভালোবাসা চাইতে হবে না, ছিনিয়েও নিতে হবে না, ভালোবাসা তিনি বিলিয়ে দেবেন বাতাসের মতো—দেখা যাবে না, কিন্তু অনুভবে ভরে যাবে প্রাণ, পাওয়া যাবে বেঁচে থাকার নির্মল আনন্দ।

সপ্তাশ্চর্যে সুন্দরবনের নাম নেই, এ দিনের শেষেই জেনেছি আমরা। অবাক হয়েছেন অনেকেই। হয়েছেন হতাশ। পেয়েছেন কষ্টও। কিন্তু অনেক আশ্চর্যের জিনিস যে আমাদের এই দেশে আছে, অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে যে প্রতিদিন—নেত্রকোনার মেয়র আলহাজ লোকমান হোসেনের খুনিকে খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ!

প্রাণিজগতের অমোঘ একটা নিয়তি হচ্ছে, বয়স হয়ে গেলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, চোখে কম দেখে তারা তখন। দূরের জিনিস তো দূরের কথা, আশপাশের কোনো জিনিস, এমনকি হাতের কাছের জিনিসও খুঁজে পায় না তারা। আমাদের ঘাড়ে যারা বসে আছেন, আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় যারা পেটের ভাত জোগান, আমাদের বঞ্চিত করে যারা বিলাসী হয়ে ওঠেন, আমাদের প্রতিনিয়ত কষ্টে রেখে যারা সেবা করার অভিনয় করেন—তাদের শুধু চোখের জ্যোতিই কমে যায়নি, মান+হুঁশ মিলে যে মানুষ, সেই মানুষ পরিচয়ের যোগ্যতাও কমে গেছে। আমাদের ঘিরে আছে একদল ফসিল, নির্জীব ফসিল!

ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, আমরা তাই জানি না। অনেক বৃহৎ মানুষ জানেন—লোকমান হোসেনের হত্যাকারী কে? মাত্র পাঁচজনকে ন্যাংটা করে গাছে ঝুলিয়ে পাছায় ঠিকমতো পেটালেই যে কোনো একজন গড়গড় করে স্বীকার করে ফেলবে—আমি মেরেছি, আমি মেরেছি।

হায়, দেশে এত অমানুষ বেড়ে গেছে যে, মাত্র পাঁচজনকে ঝোলানোর মতো কোনো মহৎ, কোনো সাহসী মানুষ নেই, আমাদের! হায়রে, কথা বলার পরিবর্তে এখন থেকে ঘেউ ঘেউ করতে ইচ্ছে করছে আমার!

একটি কুইজ : তেলের দাম আবার বেড়েছে, কিন্তু একটা জিনিস তবুও কমবে না দেশে। জিনিসটা কী?

উত্তর : তেলবাজ।

সতর্কবাণী তেলবাজ তেলগ্রহীতাদের চোখকে এক ধরনের অন্ধ করে দেয়। তারা জায়গা-জমি, টাকা-পয়সা, ক্ষমতা—সবকিছু দেখলেও মানুষের কষ্ট দেখতে পায় না, মানুষের হাহাকার দেখতে পায় না। অন্ধ উঁই পোকার মতো তারা সামনে যা পায় তা-ই সাবাড় করে দেয়, সাবাড় করে দেয় মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম সাধ!

ভারতের সঙ্গে কথিত গোপন চুক্তির মতো তোমার সঙ্গে কিছু চুক্তি আছে আমার। গোপনই। কেবল তুমি আর আমি জানি। অন্যের কী ভালো হবে, না হবে; সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমরা আমাদের ভালো চাই, আমাদের নিরাপত্তা চাই। তাই এই গোপন সন্ধি, গোপন বোঝাপড়া। তবুও পদ্মা সেতু নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের পারিবারিক কোম্পানি সাকোর ভূমিকা যেমন ফাঁস হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, ফাঁস হয়ে যায় আমাদের ব্যাপারটাও। সাকোর ভূমিকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের কোনো কিছু যেমন দেখতে পান না, তেমনি আমরাও কোনো অসুবিধা দেখি না আমাদের। কেবল বিশ্বব্যাংকরূপী প্রতিটা অভিভাবক বাগড়া দেন মাঝে মধ্যে। নিজেকে ভালো করে তৈরি করতে পারলে সেটাও দূর হয়ে যায় এক সময়।

ওয়েবসাইটে কিছু প্রশ্ন পেয়েছি আমি। উত্তরও। একটা ছাত্রকে প্রশ্ন করা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে গিয়ে তুমি কী কী শিখেছ?'

ছাত্রটি এক সেকেন্ডও না ভেবে উত্তর দিয়েছিল, 'মুখ না খুলে কীভাবে হাই দিতে হয়, চোখ খোলা রেখে কীভাবে ঘুমাতে হয়, লেকচারারের ওপর চরম রাগ কীভাবে দমন করতে হয়।'

প্রশ্নটি অন্যভাবে এবার তোমাকে করি। খুব বুঝে শুনে উত্তর দেবে। বাংলাদেশে বাস করতে গিয়ে তুমি কী কী শিখেছ?

প্রতিশোধ

'ক্ষমতায় গেলে একেকজন এত ফালতু কথা বলে! মুখ না খুলেও, কোনো জবাব না দিয়েও কীভাবে ইতর প্রাণীর মতো বোবা হয়ে বেঁচে থাকতে হয়; প্রতিনিয়ত যত্রতত্র অন্যায়-দুর্নীতি দেখেও চোখ খোলা রেখে কীভাবে পথ চলতে হয়; প্রতিদিন রেডিও-টিভি-পত্রিকায় চাপাবাজি দেখেও রাজনীতিবিদদের ওপর চরম রাগ কীভাবে দমন করতে হয়।'

খুব মেধাবী মেয়ে তুমি, উত্তরগুলোতেও রয়েছে তাই মেধার ছোঁয়া। এবার বলো তো দেখি—ঘুমানোর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গি কোনটি?

সময় নিলে না তুমি এবারও। ঝট করে উত্তর দিলে, 'অফিসের টেবিলে পা তুলে ঘুমানো।'

মুগ্ধ হয়ে তাকালাম আমি তোমার দিকে। ইন্টারনেটে এ উত্তরটাই দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নটা যদি ১০০ মানুষকে করা যায়, অধিকাংশ মানুষই দ্বিধা করবে উত্তর দিতে। কিন্তু তুমি কি জানো—যারা আমাদের ট্যাক্সে জীবনযাপন করেন, যারা আমাদের ভোটে ক্ষমতার চেয়ার-টেবিলে বসেন, তারা কিন্তু ওই টেবিলে পা রেখেই ঘুমান। সময়-অসময়, সবসময়ই ঘুমান। এভাবে না ঘুমালে দেশের অবস্থা এমন হবে কেন! দেশটা কীভাবে চলছে, বুঝতে পারছ না তুমি!

আঠার বছরের কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে, তাহলে কোন জিনিসটা প্রথমে ওই পুরুষের নজরে আসবে?

'তার ভালো আদব-কায়দা, ভদ্রতা-শিষ্টতা।'

সুস্থ চিন্তাশীল মানুষ বলেই তুমি সুস্থ চিন্তাটা করতে পেরেছ। আমি জানি, এ প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকেই অন্যরকম চিন্তা করত। সুস্থ চিন্তা করার মানসিকতা, শক্তি, ইচ্ছা আমাদের কমে যাচ্ছে প্রতিদিন। তাই তো কেউ ভালো কাজ করলে আমরা অন্য মানে খুঁজে বেড়াই। আরে, ধান্ধাবাজি করলেই কি তাকে ধান্ধাবাজ বলতে হয়! বুদ্ধিমান বললে ক্ষতি কি! নামের আগে মফিজ কিংবা আবুল থাকলেই কি সবাই মফিজ কিংবা আবুল? আচ্ছা তুমি কি এক মিনিটের মূল্য জানো?

'জানি।'

'কত?'

'সেটা নির্ভর করবে টয়লেটের দরজার কোন পাশে আছো তুমি?'

উত্তরটা মজার। কিন্তু তুমি কি জানো, যে মানুষটা মিরপুরে থাকে, তার অফিস যদি মতিঝিলে হয়, তাহলে অফিসে পৌঁছাতে এবং অফিস শেষে বাসায় ফিরতে দিনে তার মোট কত মিনিট সময় ব্যয় হয়? মাত্র এক মাসে সেটা মোট কত দিন, ঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়ায়? মানুষ তবুও কেন চাকরি করে, জানো?'

'কেন?'

তুমি জানো, তবুও বলছ—কেন। দাঁড়াও উত্তরটা পরে দিচ্ছি। তার আগে বলো তো, যদি পৃথিবীর সব দেশ মেয়েরা শাসন করত, তাহলে কী হতো?

'পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধ থাকত না, রাষ্ট্রপ্রধানরা একে অপরকে ঈর্ষা করতেন, কথা বলা বন্ধ করতেন একে অপরের সঙ্গে।'

'আরও একটা ব্যাপার ঘটত। তারা পরস্পর কথা বলতেন না বলে পৃথিবীর অনেক সমস্যায় সমাধান হতো না। সমস্যায় জর্জরিত হতো পৃথিবী। যেমনটা আমাদের দেশে হচ্ছে। মেয়েরা তবু এগিয়ে যাক আরও, পুরুষের পাশাপাশি মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তারাও। কিন্তু একটা ডিপার্টমেন্টে মেয়েদের চাকরি করা কখনও সম্ভব নয়। বলো তো কোন ডিপার্টমেন্টে?'

'ফায়ার সার্ভিসে। কারণ মেয়েরা ভালো আগুন জ্বালাতে পারে, নেভাতে পারে না।' আমার চেহারায় হাসি ফুটে উঠতেই তুমি কিছুটা বিদ্রূপের স্বরে বললে, 'তুমিও তো অন্যরকম চিন্তা করছ, সুস্থ চিন্তা করতে পারোনি। অধিকাংশ মেয়ে এ দেশে রান্না করে, রান্নাঘরে থাকে। আর ওখানে থাকে বলেই চুলা আই মিন আগুন জ্বালাতে হয় তাদের। তবে এটা ঠিক তারা চুলা নেভায় না, আই মিন নেভাতে পারে না! হা হা হা।'

সবসময় আমি তোমাতে মুগ্ধ প্রিয়তমা। এখনও মুগ্ধ হলাম তোমার সত্য ভাষণে। চুলা বন্ধ না করায় প্রতিদিন যে পরিমাণ গ্যাস নষ্ট হয়, এক মাসের নষ্ট করা গ্যাস দিয়ে দেড় দিনের রান্না করতে পারবে গোটা বাংলাদেশ! ছোট্ট এই জীবন, এটা একটা খেলা—খেলো, এটা একটা চ্যালেঞ্জ—মুখোমুখি হও, এটা একটা সুযোগ—গ্রহণ করো। জীবনে সবচেয়ে ভালো প্রতিশোধ হচ্ছে বেঁচে থাকা। চাকর হয়ে চাকরি করে যাচ্ছি সেই বেঁচে থাকার জন্য। এবার বলো তো এই প্রতিশোধটা কার প্রতি?

'জানি না।'

'আমিও না।'

'বাবা, তারপর?'

'তারপর ভূতটা শ্যাওড়াগাছ থেকে চলে গেল। চলে যাওয়ার সময় সে এমন একটা কাজ করে গেল না, কী আর বলব তোমাকে!'

'বাবা, ভূতদের কি কান থাকে?'

'থাকে।'

'চোখ থাকে?'

'থাকে।'

'নাক, মুখ, দাঁত?'

'হ্যাঁ, সব থাকে। ভূতদের হাত থাকে, পেট থাকে, পা থাকে, পায়ের নখ থাকে, এমনকি চুলও থাকে, কারও কারও আবার লম্বা লম্বা গোঁফও থাকে।'

'ভূতরা তো তাহলে মানুষের মতোই, বাবা!'

'হ্যাঁ। মানুষ মরে গিয়েই তো ভূত হয়!'

'মানুষ মরে যায় কীভাবে?'

'মানুষের হৃদয় যখন বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ তখন মারা যায়।'

'মানুষের হৃদয় বন্ধ হয়ে কীভাবে?'

'মানুষ যখন ঘুষ খায়, তখন তার হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ যখন চুরি করে, তখন তার তার হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ খাবারে ভেজাল মেশায়, তখন তার হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়।'

'তাহলে তো প্রতিদিন অনেক মানুষ মারা যায় আমাদের দেশে, অনেক মানুষ ভূত হয়ে যায় প্রতিদিন।

ভূতে তো দেশ ভরে যাবে, বাবা!'

'হ্যাঁ, দেশটা ভূতে ভরেই গেছে।'

সুমর্মি গভীর চোখে তাকায় আমার দিকে। কী যেন দেখে আমার চেহারায়। আমিও ভূত কি-না সম্ভবত সেটা খোঁজার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ও বলে, 'বাবা, ভূতের গল্প থাক। তুমি বরং আমাকে রাক্ষসের গল্প বলো।'

হয়তো আমি মানুষ নই!

'রাক্ষস দেখতে অনেক বড়।'

'মোটা মোটা মানুষের মতো? যাদের ভুঁড়ি আছে, তাদের মতো? যাদের গায়ে অনেক চর্বি, তাদের মতো?'

'হ্যাঁ।'

'রাক্ষসরা কী করে, বাবা?'

'রাক্ষসরা অনেক কিছু করে। তারা লুণ্ঠন করে; যারা অন্যের জিনিস দখল করে, তারা যখন যা মনে চায় তা-ই করে।'

'বলো কি বাবা? মানুষও তা-ই করে! মানুষ সরকারি জমি দখল করে, মানুষ যখন ইচ্ছে তার দাম বাড়ায়, যেখানে খুশি সেখানে এটা ওটা বানিয়ে দেশের সম্পদ নষ্ট করে।'

'হ্যাঁ। রাক্ষসরা সবকিছু একা ভোগ করতে চায়।'

'আমাদের দেশেও তো তাই বাবা। ক্ষমতায় যে যায় সে-ই সবকিছু ভোগ করে, অন্যকে কিছুই দিতে চায় না।'

'রাক্ষসরা খুব বেশি খায়, ফলে তাদের শরীরটা অনেক ফুলে-ফেঁপে ওঠে। আশপাশের সবাইকে তারা তখন তুচ্ছজ্ঞান করে।'

'বাবা, এ তো দেখি পুরো মানুষের মতো। মানুষও তো ক্ষমতা পেলে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, চোখে কালো চশমা পরে, গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করে, কারও সঙ্গে তেমন কথাই বলে না। হায় হায়, আমাদের দেশে রাক্ষসও তো অনেক!'

'হ্যাঁ মা, আমাদের দেশে রাক্ষসও অনেক।'

দু'হাত দিয়ে নিজের মুখের দু'পাশ চেপে ধরে সুমর্মি, চুপ হয়ে যায় আবার। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে আমার দিকে। এবার একটু শব্দ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'রাক্ষসের গল্পও বলার দরকার নেই, বাবা। তুমি বরং দৈত্যর গল্প বলো।'

'দৈত্যরা অনেক লম্বা হয়। অহংকার হয়ে গেলে মানুষ যেমন মাথা উঁচু করে হাঁটে, দৈত্যরাও তেমন মাথা উঁচু করে হাঁটে।'

'দৈত্যরা কি মানুষকে ভয় দেখায়, বাবা?'

'হ্যাঁ, তারা সুযোগ পেলেই মানুষকে ভয় দেখায়।'

'আমরাও তো অনেক মানুষ দেখে ভয় পাই, বাবা। আমরা শেয়ার কেলেঙ্কারির হোতাদের দেখে ভয় পাই, আমরা দুর্নীতিবাজদের দেখে ভয় পাই, আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের দেখে ভয় পাই, দেশ নিয়ে যারা প্রতিনিয়ত খেলে তাদের দেখে ভয় পাই আমরা।' সুমর্মি গলার স্বরটা দুঃখী দুঃখী করে বলে, 'মানুষ তো তাহলে দৈত্যের মতোই!'

'হ্যাঁ।'

সুমর্মি হঠাৎ আমাকে খামচে ধরার মতো করে বলে, 'এই যে কয়দিন ধরে ৪০ বছর ৪০ বছর করে কী সব বলছ তোমরা! ৪০ বছর ধরে স্বাধীন হয়েছি আমরা। এই ৪০ বছরে ভূত-রাক্ষস-দৈত্য ছাড়া কোনো মানুষ খুঁজে পাইনি আমরা!'

'পেয়েছি। নিজের সবকিছু হারিয়ে যুদ্ধ করেছেন অনেকে, তাদের নামের আগে কোনো বীরবিক্রম, বীর-উত্তম নেই; নিভৃতে বেঁচে আছেন তারা অবহেলায়, তারা কিন্তু মানুষ। ফসলের সঠিক দাম না পেয়েও, নিজেদের ক্ষতি করেও যারা প্রতিনিয়ত ফসল ফলিয়ে যাচ্ছেন আমাদের জন্য, তারাও কিন্তু মানুষ। সবাই যে খারাপ, তা নয়। অনেকেই আমাদের দেশ নিয়ে অনেক চিন্তা করেন, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন, তারাও মানুষ।'

চেয়ারে বসে আছি আমি। দু'হাঁটু মুড়ে সুমর্মি আমার পায়ের ওপর একটা হাত রেখে বলে, 'বাবা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা কোনো কম্পিউটার এক্সপার্ট হতে চাই না আমি। আমি একজন মানুষ হতে চাই, বাবা।

গলাটা ভিজে এসেছে সুমর্মির, সম্ভবত চোখ দুটোও।

'ঘটনাটা মোটেই ঘটত না, যদি না মেয়েটা আমার চোখে পড়ত। ওকে দেখার পরই তো আমার এ অবস্থা! আমি যে এখন কী করি!'

'মেয়েটাকে দেখার আগে তুই কোথায় ছিলি?'

'দাঁড়িয়ে ছিলাম ফুটপাতে।'

'নাস্তা কী বাসায় করেছিস?'

'নাস্তা কি আমি বাসায় করতে পারি! আমি যখন অফিসে আসি তোর ভাবি তখনও ঘুমায়। ডাকতে গেলেই রাগ করে।'

'নাস্তা তাহলে হোটেলে করেছিস?'

'হোটেলেই করেছি, কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। পরোটা আর সবজি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠি, দেখি, সবজির মধ্যে একটা তেলাপোকা।'

'ওটা কি মরা ছিল?'

'হ্যাঁ। শুকনা মরিচের মতো চ্যাপটা হয়ে গিয়েছিল।'

'টের পেলি কিভাবে?'

'টের তো এমনি এমনি পাই নাই। মরিচ মনে করে চুষতে গিয়েই দেখি, আমি আসলে যা ভেবেছি, তা না।'

'হোটেলের কাউকে জানাস নাই!'

'জানাতে চেয়ে ছিলাম, কিন্তু একটা কথা মনে করে জানাই নাই। মনে করলাম, জানালে তো জেনে যাবে সবাই। তার চেয়ে চুপ থাকা ভালো।'

'চুপ থাকা ভালো কেন?'

'বারে, আমি তেলাপোকাওয়ালা সবজি যেহেতু বেশ কিছু খেয়ে ফেলেছি, আর সবাইও তাহলে খাক। আমি কেবল খাব কেন, ওরা খাবে না!'

'তুই তো দেখি আচ্ছা খারাপ মানুষ।'

'খারাপ-ভালো মিলেই তো মানুষ। অধিকাংশ মানুষই সুযোগের অভাবে ভালো থাকে। একবার সুযোগই দিয়ে দেখ, খারাপ হতে কত সেকেন্ড লাগে!'

'নাস্তা যখন করছিলি, তখন কি আশপাশে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ, একটু ফাঁকে হোটেলের বয় ছিল।'

'আমি বয়ের কথা বলি নাই। আর কেউ নাস্তা করছিল কি-না।'

বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রথম ধাপ

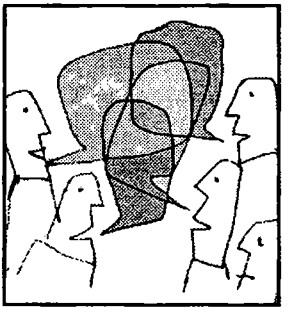

'না।'

'তাহলে তো চুপিচুপি তেলাপোকাটা হোটেলের কাউকে দেখাতেই পারতিস।'

'দেখাতে তো চেয়েছিলামই। কিন্তু এক কাজ বারবার করা কি ঠিক?'

'মানে!'

'আজ বাসা থেকে তেলাপোকা আনতে ভুল গিয়ে ছিলাম!'

'কী!'

'দোস্ত, প্রতিদিন তো এই কাজ করি না। মাঝে মাঝে করি, নতুন নতুন হোটেলে গিয়ে করি। যেদিন করি, সেদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়, তেলাপোকা খুঁজতে হয়, ধরতে হয়, মারতে হয়। বউ কিন্তু ব্যাপারটা জানে না।'

'কেন?'

'বউ তো খুব সকালে ঘুম ওঠে, তাই যেদিন তেলাপোকা ধরব, সেদিন রাতে বউয়ের চায়ে ঘুমের একটা ওষুধ মিশিয়ে দেই। বউ আর সকালে উঠতে পারে না।'

'তার মানে ভাবি প্রতিদিন ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে না।'

'হ্যাঁ, যেদিন আমার বাইরে নাস্তা করতে ইচ্ছে করে সেদিনই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে সে, আগের রাতেই ঘুমের ওষুধ খাওয়াই যে!'

'ঘরে নাস্তা করতে অসুবিধা কোথায় তোর!'

'এক হাতের রান্না আর কয়দিন ভালো লাগে দোস্ত। তবে আমি কিন্তু রাতের খাবারটা বাসায়ই খাই। সবাই মিলেই খাই।

'রাতে বাসায়ই তো ঘুমাস, নাকি!'

'না, মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ি ঘুমাই। শ্বশুর অবশ্য তেমন ভালো মানুষ না। আমাকে দেখলে কেমন করে যেন তাকায়।'

'তোর শাশুড়ি?'

'শাশুড়িকে তেমন ভালো বুঝি না আমি।'

'কেন?'

'শাশুড়ির কেস বুঝতে হলে তো কাছ থেকে দেখতে হবে তাকে।'

'দেখবি।'

'কিন্তু সেটা তো সম্ভব না। উনি তো কয়েক বছর আগে মারা গেছেন।'

'ও, তাই বল। ভালো কথা, আমরা যেন কী নিয়ে কথা বলছিলাম?'

'আমি নিজেও তো সেটা ভুলে গেছি।'

'এই তো হয়ে গেল তাহলে। টকশোতে যাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছি আমরা। কী বিষয়ে টকশো সেদিকে না গিয়ে অন্য বিষয়ে কথা বলব, তর্ক করব, কোনো সমাধান না দিয়ে বাসায় এসে ফর্সা বিছানায় নাক ডেকে ঘুমাব। চল, টেলিভিশনের ক্যামেরা নাকি রেডি, তাড়াতাড়ি যাই।'

বালিয়াকান্দির সুজনের কথা মনে আছে তোমার? সম্ভবত মনে নেই। থাকার কথাও নয়। সে তো আর কোনো মন্ত্রীর ছেলে ছিল না, ছিল না কোনো বিত্তবানের পুত্র কিংবা কোনো ক্ষমতাবানের আত্মীয়ও। ছেলে, পুত্র কিংবা আত্মীয় হলে তুমি তাকে চিনতে, মনেও রাখতে।

মাথা থেকে দেহ বা দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ছালার একটা থলিতে ভরে রাখা হয়েছিল সুজনকে। সেই থলির সঙ্গে সিমেন্টের একটা বস্তা বেঁধে সেটা ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল কচুরিপানাভর্তি একটা পানির ডোবায়। আট দিন পর সেই বস্তাটা যখন তোলা হয়, সুজন তখন গলে গেছে অনেকখানি। তার চোখের মাঝখান থেকে মণি দুটো উধাও। বিকৃত হয়ে গেছে চেহারাটাও। অথচ কোনো দোষ ছিল না আট বছর বয়সী সুজনের। কেবল তার বাবার কাছে দুই লাখ টাকা চেয়েছিল কিছু চাঁদাবাজ। সুজনের বাবা দেননি। তারপর...

ভাগ্যিস, সুজন আমাদের ছেলে ছিল না!

চলে গেল আরেকটা বছর, তবুও তুমি আছ, আমিও...

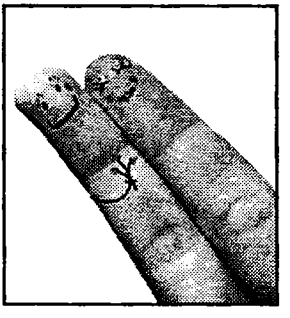

পঞ্চগড়ের সাবিহাকে মনে পড়ে তোমার? জানি, মনে পড়ার কথা নয়। যদি সে টিভি নাটকের নায়িকা হতো কিংবা কোনো পণ্যের মডেল হতো অথবা উপস্থাপক হতো কোনো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের, তাহলে সহজেই তাকে মনে রাখা যেত। অনেকে রাখত, তুমিও।

গলায় ওড়ানা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সাবিহা। তবে আমি সেটাকে আত্মহত্যা বলব না, স্রেফ হত্যা করা হয়েছিল তাকে। স্কুলে যাওয়ার পথে দুষ্ট কিছু ছেলে শিস বাজাত তাকে দেখে, কখনও কখনও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করত, কখনও সামনেও এগিয়ে আসত। একদিন একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলে তারা। গায়ে হাত দিয়ে বসে সাবিহার।

স্কুলে আর যাওয়া হয় না সেদিন সাবিহার। ফিরে আসে বাড়িতে। কিন্তু স্বস্তি পায় না কোনো কিছুতেই। তার মনে হয়, সবাই তাকে দেখে হাসছে। সবাই তাকে খাবলে ধরতে চাচ্ছে। বিদ্রূপ আর আনন্দ করছে।

নিজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এসে যায় সাবিহার। চুপচাপ বসে থেকে কী যেন ভাবে সে। ভাবতে ভাবতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয় নিঃশব্দে। এরপর সত্যি সত্যি নিঃশব্দ হয়ে যায় সবকিছু।

ভাগ্যিস, আমাদের মেয়ে ছিল না সাবিহা।

আবুলে ভরে গেছে দেশ! আবুলরাই আজ অনেক কিছুর হর্তাকর্তা। অনেক আবুল আবার ইদানীং অনেক বেশি আলোচিত, উল্লসিতও। তাই সাতকানিয়ার আবুল হোসেন নামের সাধারণ মানুষটিকে আমরা চিনি না, জানি না, ভাবি না তার কথা। অথচ সুন্দর একটা জীবন ছিল তার।

আবুল হোসেনের দূর সম্পর্কের এক চাচা ছিলেন, আলতাফ হোসেন। কে বা কারা তাকে মেরে ফেলে একদিন। এরপর লাশটি রাতের আঁধারে ফেলে রেখে যায় তাদের বাড়ির সামনে। বাড়ির সবাই ছুটে যায় এলাকার চেয়াম্যানের কাছে। চেয়ারম্যান শোনান নতুন কথা—সাক্ষী হতে হবে। কয়েকজন আসামির কথা বলেন চেয়ারম্যান, যাদের সঙ্গে বিরোধ আছে তার। রাজি হন না হোসেন। এরপর চেয়ারম্যানের রোষানলে পড়ে সরাসরি জেলে। আট বছর জেল খাটার পর মুক্তি পান তিনি। কিন্তু কী করে যেন খালানামাটি চাপা পড়ে যায় অনেক ফাইলের নিচে। ধুলোর আস্তরণ থেকে বের হয়ে আসে অবশেষে সেটি। ততদিনে ১৮ বছর ৪ মাস কেটে গেছে হোসেনের। 'কে ফিরিয়ে দেবে আমার যৌবন, এতগুলো বছর? আতঙ্কে কেন দিন কাটে আমার? আমার কেন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে?' জবাব দেয় না কেউ। নির্লজ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই তার সামনে। বলো, একজন সাধারণ নয়! বলো, লজ্জায় কি আমাদেরই আত্মহত্যা করা উচিত নয়? হোসেনের পা ধরে মাথা ঠেকিয়ে রাখা উচিত নয় অন্তত সাতশ বছর?

ভাগিস্য, আমাদের কোনো ভাই নন হোসেন!

হাওয়া আক্তারকে আমরা অবশ্য চিনি, ক'দিন আগে যার হাতের আঙুল কেটে ফেলেছে তার স্বামী রফিকুল ইসলাম। বিয়ের পরপরই স্ত্রীকে লেখাপড়া করতে নিষেধ করেছিল রফিক, এবং একসময় সত্যি সত্যি লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে দুবাই

চলে যায়। এসএসসির ফল বের হয়, হাওয়া পাস করেন। লেখাপড়া করার তাগিদটা জেগে ওঠে তার ভেতর প্রবল হয়ে। ভর্তি হয়ে যান তিনি কলেজে।

দুবাই থেকে ফেরত আসে রফিক। মিথ্যা কথা বলে স্ত্রীকে ডেকে আনে ঢাকায় বোনের বাসায়। এরপর হাওয়াকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। ওড়না দিয়ে চোখ বাঁধে তার, মুখে লাগায় স্কচটেপ, চাপাতি দিয়ে কেটে ফেলে ডান হাতের আঙুল! রফিকুল ইসলাম হয়ে যায় বর্বর রফিক!

ভাগ্যিস, আঙুল কাটা হাওয়া আক্তার আমাদের কোনো বোন নন!

চলে যাচ্ছে আরেকটি বছর। চলে যাচ্ছে সময়। কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে কী? আমরা না হয় সেটা না-ই ভাবি। বরং যা রেখে যাচ্ছে, সেটা আমরা বলি। ভোরের পাখি এখনও আমাদের ঘুম ভাঙায়; লিবিয়া, ইরাক কিংবা সিরিয়ায় পাখি তার ডাক ভুলে গেছে। বটবৃক্ষের ছায়া এখনও আমাদের শীতল করে; ইথিওপিয়া, উগান্ডার মানুষেরা সবুজ কী জিনিস ভুলে গেছে। নদীর কুলকুল শব্দ আমাদের এখনও ঘুম এনে দেয় চোখে; মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মানুষ তো দূরের কথা শাসকদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

এখনও পথের কোনো অবহেলিত ফুল দেখে আমরা থমকে দাঁড়াই, সবুজ একটা পাতা দেখে উদ্বিলিত হই, শিশিরের নিঃশব্দতায় নিজেরাও মৌন হই। আমরা এখনও মায়ের পরশ পাই, বাবার আদর পাই, ভাইবোনের অকৃত্রিম স্নেহ পাই। আমরা এখনও একে অন্যের দুঃখে ব্যথিত হই, সুখে হই আনন্দিত। আমাদের মানবিকতা এখনও বেঁচে আছে, মানুষ্যত্ব টিকে আছে। আমরা এখনও সম্মান করতে ভুল করি না, এখনও ভালোবাসতে কার্পণ্য করি না, নিজেকে উজাড় করে দিতে দ্বিধা করি না।

যদি তা-ই না হবে, শিশুর কান্নায় এখনও জল আনি কেন আমরা চোখে, তার নিটোল হাসিতে হেসে ফেলে কেন আমাদের হৃদয়, মন সত্তা! আমরা সবাই অমানুষ হয়ে যাইনি, কেউ কেউ এখনও মানুষ হয়েই আছেন।

তারা আছেন, তুমি আছ, আমিও...!

যারা জীবনের শুরুতেই ঝড়, জল, কাদামাটিকে সঙ্গে করে বাঁচতে শেখে, তারা হয় অনেক বেশী দৃঢ়চেতা, সাহসী আর কর্মনিষ্ঠ। সুমন্ত আসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। আর তাই তো অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে সুমন্তর কলম এখনও কথা বলে—মানুষের পক্ষে। সমকালের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'প্যাঁচআল'-এর শেষ পাতায় এখনও তার 'বাউণ্ডুলে' স্বমহিমায় উজ্জ্বল। শুধু তা-ই নয়, সহজ-সরল ভাষায়ও যে জীবনের গল্প বলা যায়, ছুঁয়ে দেওয়া যায় পাঠকের কোমল অনুভূতিগুলো, সেটা প্রমাণ করেছে সুমন্ত। ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস, সব ধরনের লেখনীতেই তার নিজস্ব ঢং মুগ্ধ করে আমাদের। তার লেখা গল্পগুলো নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আমরা কখনও হো হো করে হেসে উঠি, কখনও বা চোখ মুছি গোপনে। আমরা, যারা সুমন্তকে অনেকদিন ধরে জানি—মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হই 'রাশীক' কিংবা 'দন্ত্যন রুহমান'কে নিয়ে। সুমন্তর সৃষ্ট এই চরিত্রগুলো কি লেখককেই ধারণ করে না অনেকখানি? আমাদের প্রশ্ন শুনে যথারীতি হাসে সুমন্ত—রহস্যময় হাসি। পর মুহূর্তে যখন আড্ডার মধ্যমণি হয়ে সুমন্ত মাতিয়ে রাখে আমাদের, তখন আবার ওর মধ্যেই খুঁজে পাই ওরই সৃষ্ট মজার উপন্যাসের কোনো চরিত্রকে। তার লেখা কিশোর উপন্যাসের কোনো ডানপিটে চরিত্র আমাদের সামনে ফিরিয়ে আনে সেই দুরন্ত কিশোর সুমন্তকে। সব কৌতূহল, সব বিশেষণ শেষ করে আমরা যখন উপসংহারে পৌঁছাই তখন অবাক হয়ে দেখি আমাদের পাশে আমাদের সেই বন্ধু—অভিমান, রাগ, ভালোবাসা সব একাকার হয়ে মিশে আছে যার সত্তায়।

নাগরিক ব্যস্ততা আজকাল চুরি করে নেয় আমাদের অবসর। মুঠোফোনে কুশল বিনিময়ে তাই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অধিকাংশ সময়। তবু কোনো কোনো শীতের রাতে বনভোজনের হঠাৎ আয়োজনে ফিরে আসে আমাদের সেইসব দিন, অনিশ্চয়তায় ভরা মধুর সেই সব দিন। হাজার ব্যস্ততা উপেক্ষা করে, আমাদের সব আশংকাকে মুছে দিয়ে সেখানেও ঠিক ঠিক হাজির হয় সুমন্ত। সামনে জ্বলতে থাকা আগুনের কুণ্ডলীতে হাত সেঁকতে সেঁকতে একই রকম আন্তরিক গলায় বলে, 'বন্ধু কী খবর, বল!'

—কাছের বন্ধুরা